দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

ভারতীয় মুক্তি সাধনের আপোশহীন যোদ্ধা বিনায়ক দামোদর সাভারকর

— পৃঃ - ১৪

জাপানে মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু

— পৃঃ- ১৬

৬৮ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা।। ২৩ মে ২০১৬।। ৯ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

দেশদ্রোহীদের আঁতুড়ঘর যাদবপুর

শিল্পী স্বাধীনতার ঠিকাদারদের হাতেই নির্যাতিত হলেন চিত্র পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী

চরম শারীরিক নির্যাতন করার পর পরিকল্পনা মাফিক শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনা হল অধ্যাপকের বিরুদ্ধে

পুলিশকে ঢাল করে যাদবপুরের গড় বাঁচাতে মরিয়া তথাকথিত বিপ্লবীরা

যাদবপুরের সংস্কৃতি!

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা, ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২৩ মে - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

আইনের শাসন নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মর্জির শাসন কায়েম করতে চান পশ্চিমবঙ্গে □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

পার্থদা কি দিদি হতে চাইছেন? □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ব্যারিকেড আসলে রাজ্য পুলিশের গার্ডওয়াল □ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস □ ১২

ভারতীয় মুক্তি সাধনের আপোশহীন যোদ্ধা বিনায়ক দামোদর সাভারকর □ ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় □ ১৪

জাপানে মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু □ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ১৬

বেদশাখা □ অমিত ঘোষ দস্তিদার □ ২১

কেরলের পোঙ্গল মহোৎসব □ ২৩

সেই আশ্চর্য বৃদ্ধি আবার ফিরে আসবে; মোদী সরকারকে এক প্রতিবন্ধী উত্তরাধিকারের সঙ্গে দু'বছর লড়াই চালাতে হচ্ছে □ অরবিন্দ পানাগড়িয়া □ ২৭

কমিউনিস্ট, মাওবাদী, নকশালিদের হাতে আক্রান্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় □ কিশোর বর্মন □ ২৯

যাদবপুর কাণ্ড : উপাচার্য ও সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা □ ৩২

মহা চরিত্রাভিনেতা রাসবিহারী □ মনীন্দ্রনাথ সাহা □ ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৮** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাজ্য রাজনীতিতে কে কোথায় দাঁড়িয়ে

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য-রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলি কে কোথায় দাঁড়িয়ে, সেটাই এবারের বিশেষ বিষয়। লিখেছেন অভিমন্যু গুহ, অম্লান কুসুম ঘোষ প্রমুখ।

দাম একই থাকছে ১০ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মালেগাঁও কাণ্ড : ভণ্ডামিরও সীমা রহিয়াছে

মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডে অভিযুক্ত প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর-সহ আরও পাঁচজনকে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এন আই এ) সম্প্রতি 'ক্লিনচিট' দিয়াছে। কেননা এইসব অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ এন আই এ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। মালেগাঁওয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়াছিল ২০০৬ ও ২০০৮ সালে। প্রায় হাজার লোক এই বিস্ফোরণে প্রাণ হারান। ২০০৮ সালের মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় প্রথমে মুম্বই পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখা (এটিএস) তদন্ত করে। পরে ২০১১ সালে তদন্তের ভার কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (এন আই এ)-র হাতে চলিয়া যায়। ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মালেগাঁওয়ে রমজানের নামাজ আদায় করিয়া ফিরিবার সময় যে বোমাটির বিস্ফোরণ হয় তাহা রাখা ছিল এই মামলার মুখ্য অভিযুক্ত সাধ্বী প্রজ্ঞা ঠাকুরের বিক্রয় করিয়া দেওয়া মোটর সাইকেলে। এন আই এ তদন্ত অনুসারে মোটর সাইকেলটি সাধ্বীর হইলেও সেইটি বিস্ফোরণের দুই বৎসর আগে হইতে ব্যবহার করিতেন রামচন্দ্র কালসাংরা।

মোদী সরকারকে আক্রমণ করিবার জন্য কংগ্রেস-কমিউনিস্ট ও সেকুলারদের কাছে তেমন জোরদার ইস্যু না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্তকে বিকৃতভাবে তুলিয়া ধরিয়া দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করিতে হইবে। সাধ্বী প্রজ্ঞা-সহ অন্য পাঁচজনকে ক্লিনচিট দিলেও কর্নেল পুরোহিত ও অন্য অভিযুক্তদের উপর হইতে মকোকা প্রত্যাহারের বিষয়টি এনআইএ আদালতের নির্ণয়ের উপরই ছাড়িয়া দিয়াছে। আদালত অনেক সময়ই তদন্ত সংস্থাগুলির সহিত একমত না হইয়া রায় দিয়াছে। উদাহরণ হিসাবে আরুষি হত্যাকাণ্ড মামলার রায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কমপক্ষে মুম্বইয়ের আদর্শ আবাসন কেলেঙ্কারির কথা কংগ্রেসের স্মরণ থাকা উচিত। এই কেলেঙ্কারির তালিকা হইতে তৎকালীন রাজ্যপাল অশোক চৌহ্বানের নাম বাতিল করিবার জন্য সিবিআই-এর অনুরোধ আদালত স্বীকার করে নাই। কাঁচের ঘরে বসিয়া ঢিল ছুঁড়িলে কী পরিণাম হইতে পারে তাহা না বুঝিবার মতো কংগ্রেস ন্যাকা নহে। প্রশ্ন হইল, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যদি বাস্তবিকই তথ্য প্রমাণ থাকিত তবে গত আট বছরে তাহাদের কেন শাস্তি দেওয়া হয় নাই? যেখানে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ২০০৮ সালে করা হইয়াছিল।

কংগ্রেস-কমিউনিস্ট-সেকুলারিস্টদের ভণ্ডামি যে কতদূর যাইতে পারে তাহা আর একটি আদেশের দিকে দেখিলেই বোঝা যাইবে। মাত্র কয়েক মাস আগে এন আই এ মালেগাঁও মামলায় অভিযুক্ত আটজনকে ক্লিনচিট দিয়াছিল। তখন কিন্তু কোনো হইচই করা হয় নাই। ক্লিনচিট প্রাপ্ত ওইসব অভিযুক্তরা কি মুসলমান ছিল বলিয়া? আর ইহা যদি না হয় তাহা হইলে কংগ্রেস কেন বলিতেছে যে, কাহারও বিশেষ অঙ্গুলি হেলনে তদন্ত সংস্থাগুলি পরিচালিত হইতেছে?

সাধ্বী প্রজ্ঞাকে ক্লিনচিট দেওয়ার পর মহারাষ্ট্রের সন্ত্রাস প্রতিরোধকারী সংস্থা এটিএস-র প্রতি যেন আস্থা একটু বেশি বাড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের বক্তব্য, এনআইএ এটিএসের তদন্ত কীভাবে খারিজ করিতে পারে? ইহারা বোধহয় জার্মান বেকারির ঘটনার কথা মনে রাখিতে চাহেন নাই। জার্মান বেকারি মামলায় ফাঁসির সাজা হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হিমায়ত বেগের বিষয়েও তাঁহারা কি একই কথা বলিবেন? এটিএস-এর কথা মতো জার্মান বেকারিতে বোমা রাখিবার কাজটি হিমায়ত বেগ-ই করিয়াছিল, কিন্তু এনআইএ তাহা স্বীকার করে নাই। আর ইহার ফলেই বেগ ফাঁসির সাজা হইতে ছাড় পাইয়া যায়। লজ্জাজনক রাজনীতি ছাড়া ইহাকে আর কী বলা যায়? এনআইএ যখন জার্মান বেকারি ও মালেগাঁও ২০০৬-এর বিস্ফোরণ লইয়া এটিএসের সিদ্ধান্ত খারিজ করে, তখন সব চুপ আর যখন ২০০৮-এর মালেগাঁও বিস্ফোরণ লইয়া এটিএসের সিদ্ধান্ত খারিজ করে তখন ইহাদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। ভণ্ডামিরও একটা সীমা রহিয়াছে।

সুভাষিতম্

বহুনামপ্যসারাণাং সমবায়ো দুরত্যয়ঃ।
তৃণৈর্বিধীয়তে রজ্জুর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।।
অতি সাধারণ বস্তু একত্রিত হলে কঠিন হয়ে যায়। যেমন ঘাসের তৈরি দড়ি দিয়ে মত্ত হাতিকেও বেঁধে রাখা যায়।

মালেগাঁও বিস্ফোরণ : সাধ্বী প্রজ্ঞা-সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সন্ত্রাস বিস্ফোরণ আর হত্যার অভিযোগ থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন সাধ্বী প্রজ্ঞা সহ পাঁচজন। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এন আই এ) জানিয়েছে, ২০০৮ সালের মালেগাঁও বোমা বিস্ফোরণে সাধ্বী প্রজ্ঞা, শিবনারায়ণ কালসাঙরা, শ্যাম ভবরলাল সাহু, প্রবীণ টাক্কালকি, লোকেশ শর্মা এবং ধনসিংহ চৌধুরির জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সমস্ত অভিযোগ থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এন আই এ ইতিমধ্যেই চার্জশিট দাখিল করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওতে যে বিস্ফোরণ হয় তাতে ৭ জন মারা যান এবং ৮০ জন আহত হন। সেই প্রথম 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ', দক্ষিণপন্থী 'উগ্রপন্থা' ইত্যাদি উদ্দেশ্যমূলক শব্দবন্ধের আবির্ভাব ঘটে। বিস্ফোরণের তদন্তভার দেওয়া হয়েছিল মহারাষ্ট্রের অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াড (এ টি এস)-কে। তারাই সাধ্বী প্রজ্ঞা সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের অভিযোগ ছিল, যে স্কুটারে করে বিস্ফোরক আনা হয়েছিল সেটি সাধ্বী প্রজ্ঞার নামে নথিভুক্ত। আরও বলা হয়েছিল, অভিযুক্তেরা ২০০৭ সালে স্বামী অসীমানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়েই বিস্ফোরণের ছক কষে। ব্যাপারটা যে সাজানো তখনই অনুমান করা গিয়েছিল। পরে এনআইএ-র তদন্তে সত্য সামনে আসে। জানা যায়, যে স্কুটারের কথা বলা হচ্ছে, সাধ্বী প্রজ্ঞা সেটি বহু বছর আগে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। পরে তা কোনোভাবে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে পৌঁছয়। সুতরাং বিস্ফোরণের দায় কোনোভাবেই সাধ্বী প্রজ্ঞার ওপর বর্তায় না।

পুলিশ পরিবেষ্টিত সাধ্বী প্রজ্ঞা।

ওদিকে, এন আই এ তাদের তদন্তের যথার্থতা বিষয়ে কতটা আত্মবিশ্বাসী তা বোঝা যায় এক আধিকারিকের কথায়। তিনি বলছেন, 'কেউ কেউ আমাদের বিরুদ্ধে কোর্টে যাবার কথা ভাবছেন। আমরা তাঁদের চ্যালেঞ্জ করছি।' তাঁর কাছ থেকে এও জানা গেল ছ'জনের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ প্রত্যাহার করা হলেও, আরেক অভিযুক্ত কর্নেল প্রসাদ পুরোহিতকে এখনই ছাড়া হচ্ছে না। তবে তার বিরুদ্ধে ধারা অনেক লঘু করা হচ্ছে। মহারাষ্ট্র কনট্রোল অব অরগানাইজড ক্রাইম (এম সি ও সি এ)-র ধারা লঘু করে শুধুমাত্র বেআইনি কাজের ধারা প্রয়োগ করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট বা এন আই এ কেউই তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নয়।

সব শেষে তিনি। একদা প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর, আজকের সাধ্বী প্রজ্ঞা। সাজানো অভিযোগ আর দীর্ঘ যন্ত্রণাময় কারাবাসের পর এই মুক্তি— কেমন লাগছে তাঁর? সরাসরি কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে অনেকদিন আগে তিনি একবার বলেছিলেন, 'আইনের মর্ম যাঁরা বোঝেন, প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে যাঁদের শ্রদ্ধা আছে— তাঁরা নিশ্চয়ই একদিন এগিয়ে আসবেন।' আজ নিশ্চয়ই তাঁর মনে হচ্ছে সেই 'একদিন' এসে গেছে। যখন শুধু হিন্দুত্বের মতাদর্শে বিশ্বাস রাখার জন্য শাসকের কোপদৃষ্টিতে পড়তে হবে না। দেশের অন্তরের কথা বলার জন্য সন্ত্রাসবাদীর তকমা জুটবে না।

তার থেকেও বড়ো কথা জাতীয় সত্যের প্রশ্নে দিশেহারা শাসক বালখিল্যের মতো আচরণ করবে না।

গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান : সংসদীয় কমিটির নতুন প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গঙ্গাকে আরও সজীব করে তোলার জন্য গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের কাজ শুরু হয়েছে অনেকদিন। কিন্তু অগ্রগতি বিশেষ হয়নি। এর জন্য প্রকল্প রূপায়ণে যারা যুক্ত তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবকে দায়ী করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

এদিকে, মাত্রাতিরিক্ত বিলম্বের কারণে প্রকল্পের খরচ বেড়ে যাওয়ায় ব্যয়-নিয়ামক সংসদীয় কমিটি সম্প্রতি গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের কাজে গতি আনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি আলাদা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছে। সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান, বিজেপি সাংসদ মুরলীমনোহর জোশী জানিয়েছেন, নতুন কমিটি অ্যাকশন প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রকল্পের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন করবে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দেশের জাতীয় নদীকে পুনর্জীবিত করার কাজ শেষ করবে। কমিটি সংসদীয় ক্ষমতার পরিসরে থেকেই কাজ করবে বলে জানিয়েছেন সাংসদ। নদীর অবাধ গতির জন্য যা প্রয়োজন অর্থাৎ জমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে ভূগর্ভস্থ সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের সংস্কার সবই কমিটি করতে পারবে। সাংসদের সুপারিশ গ্রাহ্য হলে ঝিমিয়ে পড়া গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের পালে হাওয়া লাগবে বলেই মনে করছেন পরিবেশবিদরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন-বেটোয়া, দামানগঙ্গা-পিঞ্জল, পার-তাপি- নর্মদা ইত্যাদি নদীগুলিকে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য রুগ্ন নদীগুলিকে বাঁচানো এবং সংলগ্ন অঞ্চলে জলসেচ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তোলা।

জামাত নেতা নিজামির ফাঁসি নিয়ে পাক খবরদারি বরদাস্ত করবে না বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই। বাংলাদেশের জামাত নেতা মতিউর রহমান নিজামির ফাঁসির পর পাকিস্তান জানিয়েছে তারা এই ঘটনায় গভীরভাবে মর্মাহত। নিজামির অপরাধ তিনি ছিলেন পাকিস্তানের সংবিধান এবং রাষ্ট্রনীতির সমর্থক। তাই তাকে হত্যা করা হলো। স্বাভাবিক ভাবেই বাংলাদেশ তীব্র ভাষায় এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পাকিস্তানের কোনোরকম প্ররোচনামূলক খবরদারি বাংলাদেশ বরদাস্ত করবে না।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সে দেশের সংবিধান আছে আইন আছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকার আছে। সেখানকার আদালত যদি কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেয় তাহলে কার কী বলার থাকতে পারে! এভাবে কোনো দেশের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করা যায় না বলেই স্বার্থ থাকা সত্ত্বেও ভারত কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি। কিন্তু পাকিস্তান দিয়েছে। এর কারণ জামাত পাকিস্তানের সৃষ্টি। পরপর বেশ কয়েকজন নেতার ফাঁসি হয়ে যাওয়ায় জামাত-ই-ইসলামির নীচুতলার কর্মীদের এখন ত্রাহি মধুসূদন দশা। তাই এই বড় ভাই সুলভ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তান তাদের সংকেত দিল। যার অর্থ, ভয় নেই। আমরা পাশে আছি।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী অ্যাজেন্ডায় জানিয়েছিলেন ক্ষমতায় এলে তাঁর সরকার জামাত নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। তিনি তাই করলেন। সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রায় দিল আজকের যারা জামাত-ই-ইসলামি নেতা তাদের অনেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের হত্যার জন্য দায়ী। তখন তারা ছিলেন কুখ্যাত রাজাকার বা আল-বদর গোষ্ঠীতে। এই দুই গোষ্ঠীই ছিল পাকিস্তানের মদতপুষ্ট। আরও জানা গেল মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় রাজাকাররা ৩ লক্ষ

লোককে হত্যা করে। ২ লক্ষ মহিলা ধর্ষিতা হন। আর ভিটেমাটি সম্পত্তি হারিয়ে ১ কোটি মানুষ দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যেসব মানুষ দেশ ছাড়তে পারেননি তাঁদের মধ্যে অনেককে রাজাকাররা ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করে।

এই তথ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় পাকিস্তানের সহানুভূতি ঠিক কাদের দিকে। অনেকটা একই ধরনের সহানুভূতি পাকিস্তান দেখিয়েছিল ভারতে ইয়াকুব মেনন বা আফজল গুরুর ফাঁসির পর। ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার কারণে এদেশে পাকিস্তানের সহানুভূতির প্রতি সহানুভূতিশীল লোকের অভাব নেই। কিন্তু বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ নয়। ইসলামিক রাষ্ট্র। ইসলামিক ব্রাদারহুডের নিয়ম অন্যক্ষেত্রে মানলেও মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এককাট্টা। তারা রাজাকারদের অত্যাচার ভোলেনি। তাই পাকিস্তান যাই বলুক রাজাকারদের উত্তরসূরিদের ফাঁসির ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষ সরকারের পাশে থাকছেন।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের এই মনোভাব ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে খুবই ভালো। কারণ কয়েকবছর আগেও বিশেষ করে জেনারেল জিয়া, এরশাদ আর বেগম খালেদা জিয়ার আমলে জামাতের যথেষ্ট বাড়বাড়ন্ত অবস্থা ছিল। সেই সময়ে বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। কত হিন্দুকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছে। কত মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন আর কত যে মন্দির ধ্বংস হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এর সঙ্গে সমান তালে চলেছিল জোর করে ধর্মান্তকরণ। জামাতের ক্রিয়াকলাপ ধীরে ধীরে বাংলাদেশের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে তাদের মূল লক্ষ্য ভারতেও ছড়িয়ে পড়ছিল। সুতরাং জামাত দুর্বল হওয়াতে ভারত যে অনেকটা চিন্তামুক্ত এ কথা বলাই বাহুল্য।

উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের এই পদক্ষেপ অবশ্যই প্রশংসনীয়। যদিও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য হাসিনার সমালোচনাও করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি (মতিউর রহমান) নিজের গ্রামের ৪৫০ নিরপরাধ মানুষকে খুন করতে পারেন তিনি আদৌ 'মানব' কিনা—আপাতত ওই গুরুতর প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার সময় এসেছে। আগে মানবধর্ম পালন করুন তারপর মানবাধিকাররের কথা ভাবা যাবে। নচেৎ সেই পুরনো তর্কটা আবার ফিরে আসবে— ডিম আগে না মুরগি আগে!

তিস্তা শীতলবাদ সংক্রান্ত ফাইল লোপাট করতে গিয়ে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল লোপাট করতে গিয়ে সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক আধিকারিক সিবিআই-এর হাতে ধরা পড়েছেন। তাঁর নাম আনন্দ যোশী। জানা গেছে তিনি তিস্তা শীতলবাদ সবরং ট্রাস্ট সংক্রান্ত একটি ফাইল লোপাট করার চেষ্টায় ছিলেন। সিবিআই সূত্রে জানা গেছে, এই আধিকারিক বেশ কিছুদিন ধরে বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ আইন (এফ সি আরএ)-তে পঞ্জিকৃত বিভিন্ন এনজিওকে নোটিস পাঠিয়ে নানাভাবে হেনস্থা করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন। এই আধিকারিক আগে ওই বিভাগে কর্মরত ছিলেন। কয়েক মাস আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারি পদে তাঁর পদোন্নতি হয়।

খবরে প্রকাশ, আনন্দ যোশীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তে নেমে সিবিআই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সিদ্ধান্ত নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গত বুধবার তিনি নিজের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। পরে সিবিআই তাঁকে দিল্লী তিলকনগর থেকে গ্রেপ্তার করে। তবে সিবিআই তাকে গ্রেপ্তার করলেও আনন্দ যোশী তাদের সঙ্গে চূড়ান্ত অসহযোগিতা করছে বলে খবর। এদিকে সিবিআই যে এফআইআর দায়ের করেছে তাতে আনন্দ যোশী ছাড়াও আরও কয়েকজনের নাম আছে। যারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে এনজিওগুলিকে হেনস্থা করার দায়ে অভিযুক্ত। এর কারণ খতিয়ে দেখছে সিবিআই। এই এনজিওগুলির মধ্যে রয়েছে প্রখ্যাত পরিবেশবিদ সুনীতা নারায়ণের সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টও। সুনীতাদেবী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে লেখা এক চিঠিতে আনন্দ যোশীর বিরুদ্ধে খেয়ালখুশি মতো কাজ করার অভিযোগ এনেছিলেন।

সিবিআই-এর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, তিস্তা শীতলবাদ সবরং ট্রাস্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ এফসিআরএ ফাইল পাওয়া যাচ্ছিল না। সিবিআই সেটি আনন্দ যোশীর বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে। কারও অনুমতি ছাড়াই তিনি ফাইলটি বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রায় ৩ মাস নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কারণ জয়েন্ট সেক্রেটারি পর্যায়ের কোনো আধিকারিক ছাড়া কেউ ফাইল বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন না। আরও জানা গেছে এনজিও সংক্রান্ত ফাইল ছাড়াও আফগান শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্বের আবেদন-সংক্রান্ত কয়েকটি ফাইলও আনন্দ যোশীর বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

ঈশ্বরের নিজের দেশ : তাণ্ডবের পর নৈঃশব্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে এই সেদিনও কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট নেতারা প্রতিবাদে একেবারে এককাট্টা হয়ে উঠেছিলেন। অসহিষ্ণুতার অভিযোগে দাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। অথচ কেরলে এক ছাত্রীকে ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে খুন করা হলো কিন্তু তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলেন। ভারতের পর্যটন মানচিত্রে কেরল রাজ্যের ট্যাগলাইন : 'ঈশ্বরের নিজের দেশ'। ঈশ্বর কোনোদিনই নিজের দেশে এত বড়ো অত্যাচার মেনে নেন না। এই ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয় ঈশ্বর আর কেরলে থাকেন না।

কেরলের রাজ্য-রাজনীতি আপাতত এই ধর্ষণকাণ্ডে উত্তাল। মানুষ ক্ষুব্ধ, বীতশ্রদ্ধ। তাদের প্রশ্ন, পনেরোদিন কেটে যাওয়ার পরেও পুলিশ প্রকৃত অপরাধীদের ধরতে পারল না কেন? রাজ্য প্রশাসনের একাংশের ধারণা স্থানীয় সিপিআই নেতাদের দু-একজন এই ঘটনায় জড়িয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেসের চাপে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ করছে না। তাতে রাজনৈতিক মেরুকরণের আশঙ্কা। ভোটের সময় কংগ্রেস এতবড়ো ঝুঁকি নিতে চায় না।

গত ২৮ এপ্রিল কেরলে এক ছাত্রীকে বাড়ি ফেরার সময় ধর্ষণ করে খুন করা হয়। পোস্টমর্টেমে জানা যায় খুন করার আগে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে মোট ৩৮ বার কোপানো হয়েছিল। ঘটনার ভয়াবহতা নির্ভয়া কাণ্ডের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল সারা দেশকে।

এদিকে ছাত্রীর মা এমন একটি ঘটনার কথা জানিয়েছেন যার সূত্র ধরে মনে করা হচ্ছে এই ধর্ষণ এবং খুন বদলা নেওয়ার জন্যেও হতে পারে। কয়েক সপ্তাহ আগে ছাত্রীর মা বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। বাইকটি চালাচ্ছিলেন এক ঠিকাকর্মী। মায়ের চিৎকার শুনে মেয়ে বেরিয়ে আসে। ওই কর্মীর সঙ্গে তার বচসা হয়। মাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগে ছাত্রীটি বাইকের চাবি খুলে নেয়। অনেকে মনে করছেন ওই ঠিকাকর্মী দলবল জুটিয়ে মেয়েটিকে খুন করেছে। কান্নুর জেলা থেকে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তারও করে। কিন্তু ছাত্রীর মা জানিয়েছেন সে আসল অপরাধী নয়।

বিদায়ী কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ জোট প্রশাসনের এ হেন নীরবতায় সারাদেশ স্তম্ভিত। এ যেন তাণ্ডবের পর শ্মশানের নীরবতা! কেরলের যুবসমাজের আক্ষেপ, তাদের রাজ্য চিরকাল মেয়েদের জন্য নিরাপদ ছিল। কিন্তু কিছু অপদার্থ নেতার জন্য সেই সম্মান আজ ধুলোয় মিশে গেছে। এখানকার রাজনীতিকে শাসক আর বিরোধীর পিঠ চাপড়ানোর রাজনীতি বলেও মন্তব্য করেন কেউ কেউ। আর যারা অপেক্ষাকৃত প্রবীণ তাঁদের বক্তব্য, নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে এরা সারাবছর গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করে, অথচ এখানে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল কারও মুখে একটা শব্দ নেই। এই ঘটনাই যদি উত্তর ভারতে কিংবা অন্ধ্র বা কর্ণাটকে ঘটত তাহলে এরাই চিৎকার করে সবার কান ঝালাপালা করে দিত।

ভারত-সীমান্তে শক্তি বাড়াচ্ছে চীন, সতর্কবার্তা পেন্টাগনের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারত সীমান্তে সেনা বাড়াচ্ছে চীন। পাশাপাশি নিউক্লিয়ার-শক্তির আধুনিকীকরণ ও তার ক্ষমতাবৃদ্ধির দিকেও নজর দিয়েছে তারা। এই মর্মে মার্কিন কংগ্রেসে জমা দেওয়া রিপোর্টে ভারতকে সতর্ক করল পেন্টাগন। ওয়াশিংটন ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাদের বক্তব্য চীনের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা বিষয়টি দেখছে না, বরং ভারতীয় মূল্যবোধের বিচারেই বিষয়টি তাদের কাছে গ্রহণীয়। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন আগামী ৭-৮ জুন ওয়াশিংটনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে সফর হতে চলেছে তাতে উভয়দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতিই আশু লক্ষ্য। সেই কারণেই আমেরিকার এই সতর্কবাণী। সেই সঙ্গে ভারত যে অচিরেই বিশ্বে অন্যতম শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে তাও খেয়াল রেখেছে আমেরিকা। ভারত আপাতত খুঁটিয়ে দেখছে সীমান্তে সেনা জড়ো করার সর্বোচ্চ সীমা কত রয়েছে সে সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নিয়মবিধি।

উবাচ

" বাকস্বাধীনতা মানে যা খুশি বলে কাউকে অপমান করা নয়। আত্মসম্মানের নিরাপত্তা এ দেশের প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। আত্মসম্মান বজায় রেখে জীবনযাপনের অধিকার একটি মানবাধিকারও বটে। "

বাকস্বাধীনতা প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট

" আপনারা এখন অবসর নিচ্ছেন। সম্ভবত আপনাদের আক্ষেপ করতে হবে, যদি আপনাদের সময়ে দুটো সিদ্ধান্ত (জিএসটি এবং সিএএমপিএ) গৃহীত হোত, তাহলে আপনারা যে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তারাও আপনাদের জন্য গর্ব বোধ করত। "

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

রাজ্যসভায় বিদায়ী সাংসদদের অবসরের প্রাক্কালে

" বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রাঙ্গণ ব্যবহার করে কংগ্রেস রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। "

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে

স্মৃতি ইরানি
কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী

" ভারতের সঙ্গে ওয়াশিংটনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বৃদ্ধির কারণ ভারত বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হয়ে উঠছে। আমরা ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দৃঢ় করছি তার মূল্যবোধের জন্য। "

আব্রাহাম ডেনমার্ক
আমেরিকার ডেপুটি অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি

ভারত সীমান্তে চীনা সেনা সমাবেশ বৃদ্ধির প্রসঙ্গে

" আমার মনে হয় দেশের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য অনেক ভালো কাজ আমরা করেছি। যার ফল দেখতেও পাচ্ছি আমরা। "

রঘুনাম রাজন
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার গভর্নর

আইনের শাসন নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মর্জির শাসন কায়েম করতে চান পশ্চিমবঙ্গে

এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে তখন রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হয়ে গেছে। হিংসাদীর্ণ পশ্চিমবঙ্গের আকাশে বাতাসে শোনা যাচ্ছে কান্না আর হাহাকার। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরলে রাজ্যজুড়ে শুরু হবে বদলার আগুন। বিজয় মিছিলের নামে পুড়িয়ে দেওয়া হবে বিরোধীদের ঘরবাড়ি। অখণ্ড এক সন্ত্রাস কায়েম করা হবে সারা রাজ্যে। গত ২০১১-র বিধানসভার ভোটের ফল ঘোষণার পর তৃণমূল নেত্রী দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যের কোথাও যেন বিজয় মিছিল বের করা না হয়। বলেছিলেন, পাড়ায় পাড়ায় শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত মাইকে বাজবে। বদলা নয়, বদল চাই। কিন্তু এবার নেত্রী স্বয়ং আগাম বলে রেখেছেন গণনার দিন গতবারের মতো রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজবে না। দলের কর্মীরা বিরোধীদের ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নেবে। অর্থাৎ এবার বদলার রাজনীতিই হবে তৃণমূলের নীতি। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরলে রাজ্যে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের নানা এলাকা থেকে ভোট-পরবর্তী হামলার রিপোর্ট প্রতিদিনই আসছে। বাঘাযতীন এলাকায় তৃণমূল আশ্রিত গুণ্ডারা মোট পাঁচটি বাড়িতে একযোগে হামলা চালিয়েছে। কারণ, বারণ করা সত্ত্বেও বাড়ির বাসিন্দারা ভোট দেন। কলকাতার বেলেঘাটায় নির্বাচন পরবর্তী হিংসা অব্যাহতভাবে চলছে। বেলেঘাটার সরকার পাড়ায় সিপিএমের নির্বাচনী এজেন্টের বাড়িতে হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত সমাজবিরোধীরা। বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার নবগ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম ও তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে মারদাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। ভাঙচুর করা হয়েছে দোকান ও বাড়ি। ভোটের আগে তৃণমূল ছেড়ে সিপিএমে যোগ দেওয়ার অপরাধে আমডাঙায় গুলিবিদ্ধ হয় এক ব্যক্তি। কাঁচড়াপাড়ায় আক্রান্ত হন বিজেপি কর্মী বিট্টু সিং। রেল হাসপাতালে ভর্তি বিট্টুর বাঁ চোখে বারোটি সেলাই পড়েছে। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই তাঁকে লোহার রড, বাঁশ দিয়ে মারধর করেছে বলে স্থানীয় থানায় তিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন। সন্দেহ নেই চড়াম চড়াম ঢাকের বাদ্যি রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সাত দফা ভোট মিটতেই যাদবপুর,

গূঢ় পুরুষের

কলম

কসবা, ক্যানিং, ভাঙড়, বাসন্তী, বালিগঞ্জ, আরামবাগ, ধনেখালি, চুঁচুড়ায় ঢাকের বাদ্যি বাজাচ্ছে তৃণমূলের ল্যাংড়া হুলো, কানকাটা কার্তিকরা। নেত্রী ভুলে গেছেন যে হিংসা প্রতিহিংসারই জন্ম দেয়। আজ যারা খুন করছে কাল তারাই খুন হয়ে যাবে। দিদির ছাতার তলায় থেকে রাজা দত্ত তাপস মল্লিকরা খুনের রাজনীতি চালাচ্ছে। ক্ষমতার পাশার দান উল্টে গেলেই তারাও যে খুন হয়ে যাবে সে কথাটা ভাবছে না। দিদি নিরাপদে থাকবেন। তাঁর খুনে সাঙাৎরা মরবে। কথায় আছে যে তরবারিকে আশ্রয় করে যারা বাঁচে তারা একদিন তরবারির আঘাতেই মরে।

বাংলার মানুষ ভীত যে ১৯ মে ফল ঘোষণার পরে হামলা হানাহানি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। ভোট-পরবর্তী হিংসা বাম জমানাতেও ছিল। সেটা ছিল পার্টি নিয়ন্ত্রিত হিংসা বা সিলেকটিভ হিংসা। মমতা জমানায় সবাই রাজা। দলের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তাপস মল্লিকরা অবাধে পিটিয়ে মানুষ খুন করছে। যুক্তি দেখাচ্ছে মদ খেয়ে মাথার ঠিক ছিল না। নিজ নিজ এলাকায় দাপট বজায় রাখতে তৃণমূলের রাজা দত্ত, তাপস মল্লিক, ভজাই সর্দাররা সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এটাই তৃণমূলের রাজনীতি। এই রাজনীতি বা রণনীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন দলের প্রধান নেত্রী। ভোট চলাকালে তিনি হুমকি দিয়েছেন দিল্লীর দালাল পুলিশ এখানকার কিছু ভিতু পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। ভোটের পর আমরা ক্ষমতায় ফিরে সবকিছু ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নেব। নির্বাচন কমিশন ও দেশের সংবিধানকে মেনে যে রাজ্য পুলিশ কাজ করেছে তাঁরা ভিতু পুলিশ। আর নেত্রীর মর্জিমাফিক চলা দলদাস পুলিশ হচ্ছে সাহসী পুলিশ।

একটা কথা মানতেই হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশন, দেশের সংবিধানকে মানেন না। তিনি আইনের শাসন নয়, তাঁর মর্জির শাসন পশ্চিমবঙ্গে কায়েম করতে চান। এর প্রতিরোধে বিরোধী দলগুলি যদি পথে নামে তবে সারা রাজ্যে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি নেমে আসবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন যে নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাপটে তাঁর ভোট লুঠের ছক পুরোপুরি সফল হয়নি। তাই তিনি যে রেজাল্ট আশা করেছিলেন ততটা হবে না। প্রত্যাশিত ফলাফল হবে না বুঝেই তৃণমূল নেত্রী বলছেন, 'পনেরো দিনের জন্য দায়িত্ব পেয়ে কেউ যদি ভাবে মাথায় স্বর্ণমুকুট পরিয়ে দেবে, তা হলে সেটা ভুল।' তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই যে অল্প গরিষ্ঠতা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার ক্ষমতা দখল করেছেন তখন কী হবে। তৃণমূল কংগ্রেস কোনো আদর্শভিত্তিক দল নয়। গদি বজায় রাখতে তাঁকে বাহুবলী দলীয় বিধায়কদের তোয়াজ করতে হবে। আর তা করতে হলে পশ্চিমবঙ্গকে নৈরাজ্যে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় বিকল্প পথ থাকবে না। মনে রাখবেন যাঁরা ইতিমধ্যেই খুন হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে যাঁরা খুন হবেন তাঁদের পরিবারের অনেকেই তৃণমূল প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন। সেই ভুলের খেসারত তাঁদের সঙ্গে রাজ্যবাসীকে দিতে হবে। এই পাপ আমাদের সকলের পাপ।

পার্থদা কি দিদি হতে চাইছেন?

মাননীয় পার্থ চট্টোপাধ্যায়,
তৃণমূল ভবন, তপসিয়া,
কলকাতা

এমন একটা সময়ে চিঠি লিখছি যে সম্বোধনের সঙ্গে পরিচয় লেখা মুশকিল। চিঠি লিখছি ভোট গণনার আগে। আপনার হাতে যেতে যেতে যদি গণনা মিটে যায়! তখন আপনি কী অবস্থায় থাকবেন তা তো জানা নেই। যা শুনছি তা তো লেখা দূরের কথা মুখে আনতেও খারাপ লাগছে।

কিন্তু আপনি কি দিদি হতে চাইছেন? পিএইচডি জাল করা দিদির মানায়। বিরোধীনেত্রীর জাল পিএইচডি ডিগ্রি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে ছেড়ে দেন তিনি। আর আপনি কিনা শিক্ষামন্ত্রী থাকার সময়ে টুকলি করে পিএইচডি করেছেন!

দিদির পিএইচডি ডিগ্রি জাল আমি বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু দিদিই শেষে বিশ্বাস করিয়ে দিল। আপনার কেসটাও আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু খবরে যা দেখলাম তাতে বিশ্বাস হয়ে গেল। মনে হলো সত্যিই ইতিহাসের সমাপতন! তৃণমূলের দলনেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিগ্রি নিয়ে বিতর্ক পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের রাজনীতিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এবার পিএইচডি বিভ্রাটে পড়লেন আপনি তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তথা শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব। শিক্ষামন্ত্রীর পিএইচডি ডিগ্রি 'ভুয়ো ও টোকা' বলে অভিযোগ করেছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অরুণাভ ঘোষ।

রীতিমতো তথ্য ও প্রমাণ-সহ তিনি সাংবাদিকদের জানান, শিক্ষামন্ত্রীর গবেষণাপত্রটি অন্যান্য লেখক ও ইন্টারনেট থেকে হুবহু টোকা। অরুণাভবাবুর মেয়ে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি স্কলার আত্রেয়ী ঘোষও ছিলেন সেখানে। তিনি বলেন, বাবার কথাতেই শিক্ষামন্ত্রীর গবেষণাপত্রটি পড়া শুরু করেন। আত্রেয়ীর কথায়, ...আমি প্রথম দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, জেএনইউ ও প্রেডিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচিডি করছে এ রকম বেশ কয়েকজন বন্ধুকে বিষয়টি জানাই। তারপর শিক্ষামন্ত্রীর গবেষণাপত্রের সফট কপিটি পড়ে দেখি। প্রথমেই যেটা মনে হয়েছে, গবেষণাপত্রটি ফর্মাট মেনে করা হয়নি। ভুল ফর্মাটের জন্যই এটি বাতিল হয়ে যায়। দেখা যায়, পুরো গবেষণাপত্রের গড়ে ৭৭ শতাংশই নকল করা হয়েছে। কোনো অধ্যায়ে নকল করা হয়েছে ৮০ শতাংশ, কোথাও নকল করা হয়েছে ৫০ শতাংশ, কোথাও আবার ৬০ শতাংশ। সবচেয়ে কম নকল করা হয়েছে 'অ্যাকনলেজমেন্ট' অধ্যায়ে। সেদিন এর সপক্ষে অরুণাভ ঘোষ যে সিডি-টি দিয়েছেন সেটি আমি দেখেছি। দেখেছি সেখানে আপনার গবেষণাপত্রটি কোথাও ইন্টারনেট, কোথাও পাবলিকেশন কোথাও আবার স্টুডেন্টস পেপার থেকে নকল করা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচিডি করেছেন আপনি। আপনার গাইড ছিলেন অধ্যাপক অনিল ভুঁইমালি। 'Transforming Indian economy into knowledge economy : the role of human resources with reference to India.' শীর্ষক গবেষণাপত্রের অধিকাংশ অংশই যে হুবহু অন্য গবেষণাপত্রের নকল সেটা পরিষ্কার।

এটি টোকা পিএইচিডি প্রমাণ হলে শুধু আপনিই বিপদে পড়বেন না, আপনার শিক্ষক তথা গাইড অনিল ভুঁইমালিও বিপদে পড়বেন। তবে আপনার ভয় নেই পার্থদা। পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়। আপনার দলনেত্রী ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের হলফনামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে পিএইচিডি ডিগ্রি লিখেছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই নির্বাচনে হেভিওয়েট সিপিএম প্রার্থী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে সাংসদ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রমাণ হয়েছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ইস্ট জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছিলেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অস্তিত্বই নেই।

সুতরাং আপনার আর ভয় কীসের? আর যাঁরা মানেন, যে শিক্ষকরা আপনার গবেষণাপত্র পরীক্ষা করে ডিগ্রি দিলেন তাঁরা কি চোখে ঠুলি পরেছিলেন! একজন শিক্ষামন্ত্রী, তাঁর কত কাজ। একজন দলের মহাসচিব, তাঁর কত কাজ। তাঁর পক্ষে কি সব অরিজিনাল লেখা সম্ভব? তাহলে দেশের কাজ, দলের কাজ কে করবে!

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় যখন ডিগ্রি দিয়েছে তখন কিচ্ছু বলা যাবে না। আদালতে দাঁড়িয়ে আপনি বলবেন, শিক্ষকরা যদি দলদাস হয়ে ডিগ্রি দেয় তবে শিক্ষামন্ত্রী কী করবেন!

কিন্তু প্রশ্ন অন্য। অন্যায় আপনি একটা করেছেন। টুকলি করাটা অন্যায় নয়। দিদিকে নকল করার চেষ্টাটা কিন্তু ঘোর অন্যায়।

— সুন্দর মৌলিক

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ব্যারিকেড
আসলে রাজ্য পুলিশের গার্ডওয়াল

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

দাবা বা লুডোর ছক ভেঙে ফেলে কারা? যারা খেলায় জেতে তারা নয়। চাল বুঝে যারা বোঝে এরপর কিস্তিমাত হতে যাচ্ছে, ঘরে গুটি পচে পচে হারা ছাড়া গতি নেই— তারা দাবার বোর্ড বা লুডোর ছক ভেস্তে দেয়। যাদবপুরের ৬ মে তারিখের ঘটনা থেকে এই সত্য আর একবার স্পষ্ট হলো। বিবেক অগ্নিহোত্রী-র চলচ্চিত্র— 'বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম' দেখানোর সময় ধুন্ধুমার ঘটালো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিপ্লবী' ছাত্রছাত্রীরা। অবশ্য ওরা যদি ছাত্রছাত্রী হয় তাহলে ছত্রিশ বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাকে সমাধিতে পাঠাতে হয়। ছাত্রসমাজ ব্যতিক্রমী চিন্তা আশ্রয় করে। নতুন বিষয়কে বুঝে নেয়— বিতর্ক করে। ছাত্রসমাজ প্রতিবাদ করে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রতিবাদে স্লোগানের ঝড় তোলা কিংবা একই সময় কাছাকাছি আর একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যে-কোনো মাপকাঠিতেই স্রেফ অসভ্যতা ছাড়া কিছুই নয়। 'বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম' কী এমন বিপজ্জনক চলচ্চিত্র যা প্রদর্শন করলে ওই ছাত্রছাত্রীদের গাত্রদাহের চূড়ান্ত হলো? বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি মুক্ত মনে বিতর্ক করার পরিবেশ আছে, সব ধরনের মত প্রকাশ করার অবস্থা রাখার জন্য এই ছাত্রছাত্রীরা অহঙ্কার করে। কিছুদিন আগে এরা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা কানাইয়া কুমারের হয়ে আন্দোলনের সময় ভারতের 'বরবাদি' আর কাশ্মীর মণিপুরের 'আজাদি' চেয়ে মিছিল করেছিল। এসব আওয়াজ তোলা যুক্তিযুক্ত কি না প্রশ্ন ওঠার পর ওরা বলেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত মনে সব কিছু দেখতে অভ্যস্ত। আজ তাহলে কেন অন্য মত শোনার ধৈর্য দেখাতে পারল না তারা? যখন বুঝল ওদের আচরণ মোটেই যুক্তিসঙ্গত থাকছে না— রুচি ও সভ্যতা ভব্যতার সীমা অতিক্রম করছে— তখন অদ্ভুত অভিযোগ তুলল— 'বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম'...দেখানোর ব্যাপারে জড়িত চারজন নাকি কাদের শ্লীলতাহানি করেছে। এই অভিযোগের মান এতই নীচ যে প্রতিক্রিয়া জানাতেও ইচ্ছা হয় না। এক ভিড় জনতার মাঝখানে, বহু গণমাধ্যমের ক্যামেরার উপস্থিতিতে এরকম ঘটনা ঘটল— কোনো ক্যামেরায় তার ছিঁটেফোটা দেখা গেল না! যে চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের মধ্যে একজন দেবাশিস রায়চৌধুরী— বঙ্গবাসী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। অধ্যাপক রায়চৌধুরীর বয়স চল্লিশ ছাড়িয়েছে, তিনি দুই ছেলেমেয়ের পিতা। এই বিচিত্র অভিযোগ তোলার আগে ছাত্রীরা একটুও ভাবলো না! আসলে চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করা, পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীকে কালো পতাকা দেখানো, তাঁর গাড়িতে ভাঙচুর করা, চালককে আঘাত করা— এসবের পিছনে যুক্তি সাজাতে ব্যর্থ এই ছাত্রদল নারীদের উপর অশ্লীল আচরণের অপ্রমাণিত অভিযোগ তুলে খেলাটাকে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছে। এই সব মস্তিষ্কশূন্য হুল্লোড় করা উচ্ছৃঙ্খল তরুণ-তরুণীদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে ভাবতে লজ্জা করছে।

'বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম' চলচ্চিত্রটি বর্তমান সময়ের শিক্ষায়তনগুলির একমাত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকতা আর ছাত্রসমাজকে এক বগ্‌গা

দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা শাসন করে মধ্যমেধার চর্চা করা প্রভৃতি বিষয়বস্তু তুলে ধরেছে। পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী জে এন ইউ-সংলগ্ন আই আই এম--- ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশনের উজ্জ্বল ছাত্র। প্রসঙ্গত জানাই ৬ মে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে লাঞ্ছিত অধ্যাপক দেবাশিস রায়চৌধুরীও দিল্লীর জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির প্রাক্তনী। আসলে জে এন ইউ-য়ের একমাত্র মুখ যাদের চোখে কানহাইয়া কুমার- অনির্বাণ ভট্টাচার্য বা উমর খলিদ— তারা বিবেক বা দেবাশিসদের সহ্য করতে পারছে না। এমন যুক্তিহীন অসহিষ্ণুতাকে নিন্দা করার ভাষা নেই। পক্ষান্তরে এরা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে অসহিষ্ণু বলে দেগে দিতে চান!

একটি কাল্পনিক শিল্পায়তন আই আই বি— ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস-এর কথা আছে 'বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম'...তে। এক উজ্জ্বল ছাত্র বিক্রম পণ্ডিত কেমন করে ওই শিক্ষায়তনে বিপ্লবী চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন হলো, কেমন করে তার উপর প্রভাব পড়ল জামশেদ ব্যক্তি নামের অধ্যাপকের, শেষ পর্যন্ত ওই ইসলামি ধর্মান্ধ বক্তির মুখ ও মুখোশ খুলে গেল বিক্রমের সামনে— এই হলো চলচ্চিত্রটির মূল কথা। একসময় বিক্রম জামশেদের লেখা নিজের নামে প্রকাশ করত। তখন মনে হোত বিপ্লববাদ, অ-সরকারী সংগঠন ও ইসলামি ধর্মান্ধতার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই— পরে তার সামনে রহস্যের চাদর খুলে গেল। বিক্রম বুঝল ভারতের সব উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রই এরকম। সর্বত্র দখল করে রেখেছে বুদ্ধিজীবীর দল— যারা আসলে দেশ বিরোধী ভাবাদর্শ চারিয়ে দিতে চায়। বিদেশি চক্রের স্বার্থে কাজ করে, অ-সরকারী সংগঠনের মুখোশের আড়ালে থেকে সন্ত্রাসবাদকে পোষণ করে, বিপ্লবী মতাদর্শ প্রচারের দ্বারা তরুণদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ভিতর থেকে ভেঙে দেয়। বিক্রম বোঝে বামপন্থী অন্তর্ঘাতই দেশের সব থেকে বড়ো শত্রু। বিদেশি শত্রুরা আমাদের বীর জওয়ানদের ৫০০ জনকে হত্যা করে বড়জোর, পক্ষান্তরে বিপ্লবের নামে মুক্তিযুদ্ধে জওয়ানরা ১৫০০ জন শহিদ হয়! এই উপলব্ধি ঘটে বলেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবীর দল 'হাত থাকতে মুখে কেন' বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সন্দেহ নেই। যতই গোলযোগ পাকানো হোক বিক্রমের উপলব্ধিটি মিথ্যা হয়ে যায় না।

'বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম' গ্রীস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার পেয়েছে। বিবেকের ঝুলিতে অল্পবিস্তর তিরিশটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার! আর সারাদেশে উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসাবে অহঙ্কার করা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সেই চলচ্চিত্র প্রদর্শন করতেই দিল না। এর চেয়ে অসহিষ্ণুতা আর কী হতে পারে! বাম রাজনীতি এখন বিতর্ককে ভয় পায় নাকি! ড্রাম বাজিয়ে চিৎকার করে মিছিল করলে মুক্ত মতাদর্শকে মূলেই মেরে ফেলা হয়— সে কথা বোঝার মতো সামান্য বুদ্ধিও কি যাদবপুরের ছাত্রসমাজ হারিয়ে ফেলল?

৯ মে সন্ধ্যায় এ বি ভি পি গোলপার্ক থেকে মিছিল নিয়ে আসছিল। যাদবপুর থানার কাছে তাদের ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয় রাজ্য পুলিশ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঙ্গল ল্যাম্প গেটের সামনে জড়ো হয় তথাকথিত বিপ্লবী ছাত্রদল। সঙ্গে তাদের বুদ্ধি জোগানোর দায়িত্ব নেন 'বিপ্লবী' চিন্তায় পুষ্ট অধ্যাপকরা! স্লোগান ওঠে : 'প্রতিবাদে প্রতিশোধে প্রতিরোধে কমরেড— গড়ে তোল গড়ে তোল গড়ে তোল ব্যারিকেড।' এই সব ছাত্ররা ঘোষণা করে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে ওই মিছিল যেতে দেবে না! আশ্চর্য কথা! রাস্তাটা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কেউ ইজারা দেননি। কোনো মিছিলের পথ রোধ করার অর্থ আইন নিজেদের হাতে নেওয়া। শুধু এই কাজ করার জন্যই ওই ছাত্রদল ও তাদের পরামর্শদাতাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায়। আর সব থেকে আশ্চর্যের কথা, ব্যারিকেড তো তৃণমূল সরকারের পুলিশ দিয়েছিল! ক্যাঙ্গারুর মতো পুলিশের কোলের আড়ালে থেকে বীরত্ব প্রদর্শনের মানে তো কাপুরুষতা, তা বোঝার জন্য খুব বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয় কি?

'বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম'--- ওই জামশেদ বক্তি বিক্রমকে বুঝিয়েছেন ভারতে কোনো কাজই দুর্নীতি ছাড়া সম্ভব নয়। সব কাজে চাই ঘুষ। সমাজটা পচে গেছে। কিন্তু জামশেদের ব্যাখ্যা এটা ভালো--- 'corruption is good.' দুর্নীতিবাজ সমাজকে সমর্থনের এই রকম যুক্তি বিক্রম মানেনি। ভারতের তরুণ সমাজ এরকম অন্যায় ব্যবস্থা ও ভুল আদর্শবাদ মানবে না— বুঝবে, তারা আসলে ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়া বুদ্ধের মতো অসহায়। তাদের মেধা ও প্রত্যয়, আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনা আটকে যাচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনগুলি ছেয়ে আছে জামশেদ বক্তিদের মতো ছদ্ম প্রগতিবাদীরা। তরুণদল যখন এই অবস্থাকে ব্যাখ্যা করবে তখন মেধাবী বুদ্ধেরা ট্রাফিক জট খুলে ফেলবে— ভারতকে নতুন দিগন্তের দিকে নিয়ে যাবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিবাদীদের সামনে এই বার্তাটি বিপজ্জনক। পুলিশের ব্যারিকেডের আড়ালে থেকে এই বিভ্রান্তিকর বিপ্লব আর কতো দিন?

(লেখক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)

ভারতীয় মুক্তি সাধনের আপোশহীন যোদ্ধা

বিনায়ক দামোদর সাভারকর

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

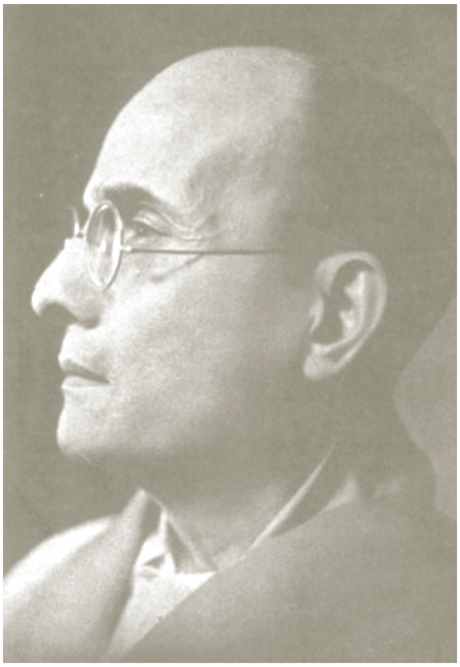

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে ভারতের জাতীয় আন্দোলন প্রকৃত অর্থে সংগ্রামী ও প্রাণবন্ত রূপ গ্রহণ করে। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও বাংলা এই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। সরকারি রিপোর্টে বিপ্লববাদী কার্যকলাপ 'সন্ত্রাসবাদ' নামে পরিচিত হয়। বৃটিশ লেখক ভ্যালেন্টাইন চিরল ভারতের অশান্ত পরিস্থিতি নিয়ে ১৯১০ সালে 'ভারতের অস্থিরতা' (Indian Unrest) নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলক এই অস্থিরতার মধ্যমণি 'Father of Indian unrest' বলে চিহ্নিত হলেন। স্বামী বিবেকানন্দ উগ্র হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের মন্ত্রদাতা ছিলেন। আর লোকমান্য তিলক সংগ্রামী জাতীয়তাবাদকে গণমুখী ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। বিনায়ক দামোদর সাভারকর এই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে ভারতের ভেতরে ও বাইরে অসামান্য কর্মযজ্ঞে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। দুঃখের কথা, সাভারকরের অসামান্য অবদান উপেক্ষা করে ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকদের অনেকে তাঁর সম্পর্কে অপপ্রচারে মেতে উঠেছেন।

বিনায়ক দামোদর সাভারকর (২৮ মে, ১৮৮৩-২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬) ছিলেন মহারাষ্ট্রের সন্তান। মহারাষ্ট্রের জাতীয় জীবনে ছত্রপতি শিবাজীর স্থান ছিল গৌরবজনক। সংগঠন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মহারাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে যে জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন তা পরবর্তীকালে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে মুঘল সাম্রাজ্যের বিকল্প শক্তিতে পরিণত হয়। মারাঠী মানসে শিবাজী কী রকম প্রভাব ফেলেছিলেন তার পরিচয় মেলে শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে। শিবাজী উৎসব জাতীয় উৎসবের রূপ গ্রহণ করে এবং এর মাধ্যমে বৃটিশ বিরোধী মানসিকতা মহারাষ্ট্রের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহাদেব গোবিন্দ রানাডের মতো সংস্কারবাদী নেতা 'Rise of Maratha Power' লিখেছিলেন আর বিপ্লববাদী সাভারকর 'হিন্দুপদ পাদশাহী' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বিপ্লববাদের অগ্নিসাধক

সাভারকরের ভাবধারা বিকাশে মহারাষ্ট্রের সংগ্রামী চেতনা যেমন অনুঘটকের কাজ করেছিল, তার সঙ্গে সমকালীন বৃটিশ বিরোধী উদ্দীপনারও সমাবেশ ঘটেছিল। মহারাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে চিৎপাবন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিশেষ ভূমিকা ছিল। মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, লোকমান্য তিলক, বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, সাভারকর সকলেই ছিলেন চিৎপাবন বংশীয়। শিক্ষা-দীক্ষায় ও সামাজিক কৌলীন্যে চিৎপাবনদের অবস্থান ছিল মর্যাদাপূর্ণ। যখন সাভারকরের বয়স চৌদ্দ, সে সময় ১৮৯৭ সালে মহারাষ্ট্র জুড়ে বৃটিশ বিরোধিতার প্রবল ঝড় উঠেছিল। পুণা শহরে ভয়াবহ প্লেগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে। এর ফলে জনরোষ তুঙ্গে ওঠে। র‍্যান্ড ও আয়ার্স্ট নামে দুজন বৃটিশ অফিসার চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের গুলিতে নিহত হলেন। তিলক জ্বালাময়ী ভাষায় সম্পাদকীয় লেখার জন্য গ্রেপ্তার হলেন। তরুণ সাভারকর বিপ্লববাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন এবং 'মিত্র মেলা' ও 'অভিনব ভারত' নামে দুটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুললেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় বিপ্লববাদ শুধুমাত্র মহারাষ্ট্র অথবা ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল না—ভারতের বাইরেও এর প্রসার ঘটেছিল।

ইংল্যান্ডে ভারতীয় বিপ্লববাদের প্রসারে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়া হাউস' ইংল্যান্ডে ভারতীয় বিপ্লবীদের স্নায়ুকেন্দ্রে পরিণত হয়। সাভারকর উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তিলাভ করে ইন্ডিয়া হাউসের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হন। ইংল্যান্ডে তিনি লালা হরদয়াল, মাদাম কামা, মদনলাল ধিংড়া প্রমুখের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। লন্ডনে থাকার সময় ১৯০৭ সালের ১০ মে, তিনি ১৮৫৭-র ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এছাড়া 'Indian War of Independence, 1857' গ্রন্থ রচনা করে সাভারকর ১৮৫৭-র সশস্ত্র জাতীয় সংগ্রামের ঐতিহ্যকে জনমানসে তুলে ধরেন। তাঁর মতে ১৮৫৭ সালে যে সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। সাভারকরের রচিত গ্রন্থ ভারতীয় বিপ্লবীদের উদ্দীপিত করেছিল। গদর পার্টির সদস্যগণ এবং পরবর্তীকালে ভগৎ সিং ও নেতাজী সুভাষ সাভারকরের রচনাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর কর্মকাণ্ডে সাভারকরের চিন্তা-ভাবনার বাস্তবায়ন ঘটেছিল। আজকাল ভগৎ সিং ও নেতাজী সুভাষের নাম নিয়ে অনেকেই ভজনা করছেন। অথচ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সাভারকর, ভগৎ সিং ও নেতাজী সুভাষ ছিলেন সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের তিন প্রধান দিশারি।

বিপ্লবী সাভারকর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্ষুঃশূল হয়ে উঠেছিলেন। ফলে ১৯১০ সালের ১৩ মার্চ গ্রেপ্তার হয়ে পঞ্চাশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কালাপানি নামে পরিচিত আন্দামানের সেলুলার জেলে তাঁর নিঃসঙ্গ দ্বীপান্তর জীবন শুরু হল। ১৯২৪ সালে রত্নগিরি জেলে স্থানান্তরিত হন। তারপর ১৯৩৭ সালের ১০ মে তাঁর দীর্ঘ কারাজীবনের সমাপ্তি ঘটে।

হিন্দুত্ব, সাভারকর ও জাতি নির্মাণ :

মারাঠী ঐতিহ্য ও বিপ্লববাদী পথ অনুসরণ করার পর সাভারকর নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি পদে আসীন হন। প্রশ্ন উঠতে পারে সাভারকর কি বিপ্লববাদের পথ থেকে সরে এলেন? তিনি কি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করলেন? এই প্রশ্ন অবান্তর। ১৯৩০ সালের পর জাতীয় রাজনীতিতে বিভেদ সৃষ্টির জন্য মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িকতার পথ অনুসরণ করে। প্রখ্যাত আইনবিদ এম. সি. চাগলা মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাকে জানিয়েছিলেন যে মুসলমান সম্প্রদায় ভারতবাসী, তাই তাদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি অযৌক্তিক। এর ফলে ঘৃণা ও সংঘাতের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। বাস্তববাদী সাভারকর বুঝেছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সক্রিয় ও গতিশীল করে তুলতে হলে নিষ্ক্রিয় তোষণ নীতি আত্মহননের পথ প্রশস্ত করবে। মহাত্মা গান্ধী ও জাতীয় কংগ্রেসের দোদুল্যমানতা তাঁর কাছে বাস্তবসম্মত মনে হয়নি। মনে রাখা প্রয়োজন, সাভারকরের 'হিন্দুত্ব' ছিল ভারতীয় আত্মপরিচয়ের আধার। হিন্দুত্ব তাঁর কাছে নিছক প্রথাগত ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা নয় অথবা সামাজিক বিভেদ সৃষ্টি নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবাসী হিন্দু। তাই তাদের মধ্যে সামাজিক সংহতি গড়ে তোলা যেমন জরুরি আবার সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করাও আবশ্যক। শ্রীঅরবিন্দ নির্জীব নপুংসকতাকে পরিহার করে সক্রিয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অপরিহার্যতার কথা বলেছিলেন। মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মকাণ্ড দেখে সাভারকর অখণ্ড জাতীয়তাবাদের ধ্রুবক হিসেবে 'হিন্দুত্ব'-এর মতাদর্শ উপস্থাপিত করেছিলেন। সাভারকর যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তা কংগ্রেস নেতৃত্ব আমল দেয়নি। এর ফল হলো মারাত্মক। ১৯৪৭ সালে ভারত দ্বিখণ্ডিত হলো। স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান সৃষ্টি হলো। স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে ভারত গৃহযুদ্ধের রক্তলীলায় নিমজ্জিত হয়। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে দ্বিখণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা ছিল মহৎ লক্ষ্যহীন, দেশপ্রেম বর্জিত ক্ষুদ্র রাজনীতির পরিণতি। ভারতীয় বিপ্লববাদের মহৎ সেনানী সাভারকরের দৃষ্টিতেও ভারতের স্বাধীনতা ছিল জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কূটনৈতিক ছলচাতুরির পরিণতি। স্বভাবিকভাবেই সাভারকর স্বাধীনতার পর একাধিক বার জাতীয় অবমাননার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। তিনি জাতীয় বিবেকবোধের আপোশহীন প্রহরী হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সাভারকর চেয়েছিলেন স্বাধীন ভারত আত্মশক্তিতে উদ্দীপিত হোক, একটি শক্তিশালী আত্মনির্ভরশীল দেশে পরিণত হোক। কিন্তু নেহরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার চীন ও পাকিস্তান এই দুই দেশের প্রতি সমান্তরালভাবে আত্মঘাতী তোষণ নীতির পথ বেছে নেয়। তাঁর ভারত দু'বার পাকিস্তানের সঙ্গে এবং একবার চীনের সঙ্গে যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট হয়। চীনের কাছে পরাজয় ভারতের সামরিক দুর্বলতা প্রকট করে তুলেছিল। আবার ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে লাহোর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল তখন যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলে সাভারকর গর্জে উঠেছিলেন। তাঁর ভাষায় 'Now let nothing stop our army in their forward march... we must not retreat for fear of what other say.' কয়েক মাস পর ১৯৬৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সাভারকর অমৃতলোকে চলে গেলেন। কিন্তু আজ পঞ্চাশ বছর পরেও সাভারকরের সক্রিয় ও সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের আদর্শ আজকের ভারতের অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশের জন্য জরুরি।

সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদের বিপদ থেকে জাতীয় সংহতি সুনিশ্চিত করা প্রধানতম জাতীয় কর্তব্য।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

জাপানে মহান বিপ্লবী
রাসবিহারী বসু

অম্লানকুসুম ঘোষ

দীর্ঘদিনের পরাধীনতার আঁধার ভেদ করে ভারতের স্বাধীনতার সূর্য সারা বিশ্বকে তার কিরণছটায় উদ্ভাষিত করেছিল ১৯৪৭ সালে। নবীন ঊষার এই পুনরভ্যুদয়ের পশ্চাতে কত মহামানবের রক্তরাঙা আত্মত্যাগের কাহিনি লুকিয়ে আছে তার হিসেব রেখেছে কেবল মহাকাল। বিদেশির বা বিকৃতমনস্ক স্বদেশীর রচিত ইতিহাস সেই আত্মত্যাগী অনেকের কথা চিরবিস্মৃত করেছে; অনেকের কথা আবার স্মৃতির মণিকোঠা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে ধীরে ধীরে। এমনই একজন মহান আত্মত্যাগী রাসবিহারী বসু। স্বাধীনতার পুণ্যলগ্নে তাঁর কথা দেশবাসীর মনোজগতে ছিল স্বর্ণাক্ষরে খোদিত। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল স্মৃতি সম্পন্ন মানুষের মন থেকে এই মহাবিপ্লবীর নাম যেন প্রায় মুছে গেছে। প্রচারমাধ্যমেরও কোনো প্রচেষ্টা নেই এই নিঃশেষে প্রাণদানকারী এই মহামানবের স্মৃতিকে চিরঅক্ষয় করে রাখার। স্কুল পাঠ্যপুস্তকের কয়েকটি পংক্তির বাইরে রাসবিহারী বসুর নাম আজ সর্বত্রই অনুল্লিখিত। এই অদ্ভুত বিচ্যুতি আমাদের এক জাতীয় পাপ। আজ এই পবিত্র লগ্নে তাঁর জীবনকথা স্মরণ করে সেই পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করা যাক।

সাধারণত বিপ্লবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী, তাৎক্ষণিক ও আকস্মিক, অথচ বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনাসমূহে পরিপূর্ণ। কিন্তু ব্যতিক্রম রাসবিহারী বসু। তাৎক্ষণিক, আকস্মিক অথচ বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনার দু' একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেই তাঁর বিপ্লবী জীবন সমাপ্ত হয়নি, বরং একের পর এক মহাউদাহরণের সৃষ্টি করে নিজের ঘটনাবহুল জীবনকে করে তুলেছিলেন উদাহরণের পাহাড়। বঙ্গভঙ্গের সেই উত্তাল সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত চারদশক ধরে (১৯১৮-১৯৪৫) রাসবিহারী বসু তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেছেন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। রত্নাকরতুল্য এই মহাজীবনের সমস্ত ঘটনারত্নসমূহের বিবরণ

এই স্বল্প পরিসরে বিবৃত করা সম্ভব নয়, বরং তার জীবনের এক বিশেষ অংশ অর্থাৎ তার জাপান প্রবাসী জীবনের (যে জীবনে তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে ভারত ভাগ্যাকাশচ্যুত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনোজগতে ভাস্করের ন্যায় ভাস্বর) বর্ণনাই দেওয়া যাক।

কাবুল থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর মাথার ওপর এক লক্ষ টাকা পুরস্কারের বোঝা (দিল্লীতে বড়লাটের ওপর বোমা নিক্ষেপের জন্য) নিয়ে রূপকথাকেও হার মানিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাইপো পি. এন. ঠাকুর সেজে (কলকাতা বন্দরে নাম বলেছিলেন প্রণবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর জাপানের কোবে বন্দরে নাম বলেছিলেন প্রিয়নাথ ঠাকুর) জাপানে আসেন ১৯১৫ সালের মে মাসে সানুকি মারু জাহাজে চেপে। বিদ্রোহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর যখন একে একে তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী বসন্ত বিশ্বাস, বিষ্ণুগণেশ পিংলে, প্রবোধবিহারী, আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ প্রমুখ ধরা পড়লেন এবং বিচারে তাঁদের ফাঁসি হল। তাঁর চিরবিশ্বস্ত সহযোগী শ্রীশচন্দ্র ঘোষ হাওড়ায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে দীর্ঘদিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন, সে সময় সংগঠন, অর্থ এবং অস্ত্রহীন রাসবিহারী মনে করেছিলেন ভারতে (তখন জাতীয় কংগ্রেস স্বরাজের লোভে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের সাহায্যকারী) থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম করা তখন সম্ভব নয়, বরং বিদেশ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে ভারতকে স্বাধীন করতে চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়। ইউরোপীয় শক্তির আধিপত্যের সেই যুগে একমাত্র এশীয় স্বাধীন শক্তি জাপানকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্র হিসেবে। কারণ তিনি ভেবেছিলেন একটি স্বাধীন দেশের নাগরিকেরা আরেকটি পরাধীন দেশের নাগরিকদের স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাবে অকুণ্ঠচিত্তে। বিশেষত সংস্কৃতিগত ঐক্যের কারণে জাপানের মানুষ যখন ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

কিন্তু জাপানে পৌঁছেও যে তিনি ভারতমাতার মুক্তির জন্য কুসুমাস্কীর্ণ ভূমি পেয়েছিলেন তা নয়। কারণ ১৯০২ সাল থেকে জাপান ও ইংল্যান্ড পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রী ও বন্দিবিনিময় চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল এবং জাপান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজপক্ষে যোগ দিয়েছিল। এমনকী রাসবিহারীর নিজের পরিকল্পিত সিঙ্গাপুর থেকে কাবুল পর্যন্ত সংগঠিতব্য মহাবিদ্রোহের (মূলত সেনাবাহিনী কেন্দ্রিক) একমাত্র অংশ যা বাস্তবে রূপ পেয়েছিল (রাসবিহারীর পরিকল্পিত বিদ্রোহ কৃপাল সিং-য়ের বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতের সর্বত্র ব্যর্থ হলেও সিঙ্গাপুরে তা সাময়িক সাফল্য পেয়েছিল, যেখানে বিদ্রোহী ভারতীয় সেনারা ইংরেজদের হত্যা করে সমস্ত সিঙ্গাপুর নিজেদের দখলে বেশ কিছুদিন রেখেছিল, তারপর একটি জাপানি যুদ্ধজাহাজ সিঙ্গাপুর দখল করে আবার বৃটিশের হাতে তুলে দেয়) তাকেও ব্যর্থ করেছিল জাপান। কাজেই তৎকালীন ইংরেজ মিত্র জাপানেও রাসবিহারী শত্রু পরিবৃত অবস্থায়ই ছিলেন। তাই তৎকালীন জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ওকুমা

ব্যক্তিগতভাবে রাসবিহারীর প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও যখন বৃটিশ সরকার তাদের চোখে অপরাধী রাসবিহারীকে তাদের হাতে তুলে দেবার অনুরোধ জাপান সরকারকে করে তখন জাপান সরকার রাসবিহারীকে ধরার জন্য হুলিয়া জারি করল। সৌভাগ্যবশত তখনকার প্রধান বিরোধী নেতা মিৎসুরু তোয়ামা সে সময় রাসবিহারী বসুকে কিছুদিন গোপনে তাঁর নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন এবং পরে তাঁর অনুগত মিঃ আইজো সোমার বাড়িতে গোপনে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। প্রায় দু' বছর এরকম অজ্ঞাতবাসে থাকার পর মিঃ আইশো সোমার বড় মেয়ে তোসিকো'র সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, যার ফলে তিনি জাপানে রাজনৈতিক আশ্রয় পান ও জাপান-ইংল্যান্ড বন্দি বিনিময় চুক্তির হাত থেকে মুক্তি লাভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই অজ্ঞাতবাসের সময়কালের মধ্যে রাসবিহারী বসু মিঃ তোয়ামার সহায়তায় বাংলার বিপ্লবীদের উদ্দেশে এক জাহাজ অস্ত্র পাঠান কিন্তু মাঝপথে বৃটিশ নৌবাহিনী সেই অস্ত্রভর্তি জাহাজ ধ্বংস করে ফেলে। কপর্দকহীন অবস্থায় সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে বেনামে ও ছদ্মবেশে থাকাকালীন এই রকম দুঃসাহসী কাজ করা যে কতখানি মহান আত্মত্যাগ ও নিখুঁত পরিকল্পনার পরিচায়ক তা সহজেই অনুমেয়।

জাপানে রাজনৈতিক আশ্রয় পাবার পর থেকে রাসবিহারী বসুর একমাত্র প্রচেষ্টা ছিল জাপানের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাহায্যে জাপান সরকারকে প্রভাবিত করে ইংরেজবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করানো, যাতে ভারতের ওপর ইংরেজ প্রভুত্ব নষ্ট হয়। সাধারণ জাপানবাসীর মধ্যে ভারতপ্রেম যথেষ্ট রয়েছে তা তিনি ততদিনে বুঝতে পেরেছিলেন (রাসবিহারীর আত্মকথা— প্রথম খণ্ড, প্রবর্তক পত্রিকা ১৩৩১ সনের জ্যৈষ্ঠ থেকে পৌষ পর্যন্ত প্রকাশিত)। তাঁর এসময়ের রচনা পড়ে জানা যায় ভারতের মুক্তি প্রচেষ্টায় অর্থ এবং অস্ত্রের অভাব তিনি পূরণ করতে চেয়েছিলেন সেইসব বিদেশি শক্তির সহায়তায় যেসব শক্তি নিজেদের স্বার্থেই ইংরেজদের শত্রু। সেসময় তিনি চীনের বিখ্যাত বিপ্লবী সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে দেখা করেন এবং তৎকালীন চীন ও ভারত দুয়েরই অভিন্ন শত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রামের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সান-ইয়াৎ-সেনের ১৯২৫ সালে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাঁর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। ইতিমধ্যে ১৯২৩ সালে জাপানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে জাপানবাসী ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন তিনি সেখানে বিপ্লবের কাজ পরিচালনা ও ভূমিকম্প-পীড়িতদের সেবার জন্য চন্দননগরে তাঁর বাল্যবন্ধু প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র ঘোষকে কিছু অর্থসাহায্য করতে বলেন। শ্রীশচন্দ্রের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের জাপান সাহায্য ভাণ্ডারের সংগৃহীত অর্থ থেকে ৬২১ টাকা রাসবিহারীকে প্রেরণ করেন। লালা লাজপত রায় ও মদনমোহন মালব্যও এসময় রাসবিহারী বসুকে অর্থসাহায্য করেন। এই ১৯২৩ সালেই তিনি জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করেন এবং এই ১৯২৩ সালেই আন্তর্জাতিক কূটনীতির আবর্তে জাপান-ইংল্যান্ড মৈত্রী চুক্তি বাতিল হয় ও ক্রমশ দুই দেশ পরস্পরের শত্রুদেশে পরিণত হয়। এই সময় থেকে রাসবিহারী কিছুটা হলেও জাপানের রাজশক্তির আনুকূল্য পান তাঁর ইংরেজবিরোধী কাজকর্ম চালানোর জন্য। ১৯২৪ সালে লালা লাজপত রায় ও গদর পার্টির কয়েকজন নেতার সঙ্গে তাঁর জাপানে পৃথকভাবে আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু দেশপ্রেমিক ও ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিকে হতাশার সাগরে নিমজ্জিত করে সেই আলোচনাসমূহের যাবতীয় বিষয়বস্তু আজও অজানাই থেকে গেছে। এসময়ে রাসবিহারীর কথা সমগ্র দেশে আলোড়ন ফেলেছিল। সকল ইংরেজ ও ভারতবাসীর কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন রাসবিহারী সেই সময়। এমনকী সশস্ত্র বিদ্রোহের চিরবিরোধী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ১৯২৪ সালে জাপান ভ্রমণকালে রাসবিহারী বসুর বাড়ি গিয়ে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন।

উপযুক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অভাবে ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৪১ সালে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নামার আগে পর্যন্ত তিনি জাপানে ইংরেজের হাতে থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে জনমত সংঘটিত করেছেন বিভিন্ন সমিতিতে ভাষণ দিয়ে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে, প্রবাসী ভারতীয়দের বিভিন্ন সংগঠন স্থাপন করে এবং ভারতের জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন লেখা জাপানিতে অনুবাদ করে। এসময় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর 'India in Bondage' বইটি তিনি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন।

ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রারম্ভ হয়ে গেছে। যুদ্ধের শুরুতেই জাপান নিরপেক্ষ থাকলেও রাসবিহারী বসু তাঁর অসামান্য দূরদৃষ্টির দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন ইংল্যান্ডের সম্প্রসারণবাদী মানসিকতার সামনে বেশিদিন জাপান নিরপেক্ষ থাকতে পারবে না এবং জাপান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে তাঁর সামনে বিরাট সুযোগ এসে যাবে জাপান এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিরাট সংখ্যক প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে ভারতমুখী আক্রমণ শুরু করার, যার ফলে ভারতের বৃটিশরাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর শরীর তখন খুব খারাপ, তাই তিনি ভারতে বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানান জাপানে এসে অদূর ভবিষ্যতে সংগঠিতব্য এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। কিন্তু সাভারকরও তখন শারীরিক ভাবে অসুস্থ (দীর্ঘ আঠাশ বছর জেল খেটে সদ্যমুক্ত), তাই তিনি তৎকালীন কংগ্রেসের সদ্য পদচ্যুত জাতীয় সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে রাসবিহারীর চিঠি দেন ও অনুরোধ করেন রাসবিহারীর স্বপ্নের কাজ সম্পন্ন করার জন্য। তখনই না হলেও নিশ্চয়ই এই চিঠি সুভাষচন্দ্রকে পরবর্তী অন্তর্ধানে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

৮ ডিসেম্বর ১৯৪১ আমেরিকার পার্ল হারবার বন্দর আক্রমণ করে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগাদান করে। এর অব্যবহিত পরেই জাপান বৃটিশের হাত থেকে হংকং, সাংহাই কেড়ে নেয় এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৃটিশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি সিঙ্গাপুরের পতন হয় জাপানের হাতে। ফলে দক্ষিণপূর্ণ এশিয়ার (যা এখন 'আসিয়ান' নামে পরিচিত) বৃটিশের কোনো কর্তৃত্ব রইল না। সেই মাসেই রাসবিহারী বসু নেতৃত্বে টোকিওয় স্থাপিত হয় ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ। শুধুমাত্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করাই নয়, জাপান অধিকৃত দক্ষিণপূর্ব-এশিয়ার সমস্ত স্থানে অবস্থিত প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষাও

(জাপানি সেনাদের সম্ভাব্য অত্যাচারের হাত থেকে) লীগের প্রধান কাজ হিসেবে গণ্য হলো। রাসবিহারী বসু জাপান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর এতদিনের পরিচয়কে কাজে লাগিয়ে জাপান সরকারকে বাধ্য করলেন সেনাবাহিনীর ওপর বিশেষ নির্দেশ দিতে যার ফলে জাপান সেনাবাহিনী তাদের অধিকৃত স্থানের সব অধিবাসীকে যুদ্ধবন্দি করলেও ভারতীয়দের যুদ্ধবন্দি হিসেবে গণ্য না করে তাদের স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা দিতে। সে সময় অন্যান্য দেশের অনেক নাগরিকও নিজেদের ভারতীয় পরিচয় দিয়ে যুদ্ধবন্দিত্ব থেকে মুক্তির চেষ্টা করলো। তখন রাসবিহারী বসুর পরামর্শে জাপানি সেনাবাহিনীকে বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল যার দ্বারা তারা অন্যদেশের নাগরিকদের থেকে ভারতীয়দের পৃথক করতে পারে। ফলস্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধবন্দিদের ওপর অত্যাচারের যে নৃশংস কাহিনি আজও শোনা যায় তার থেকে ভারতীয়রা রক্ষা পেয়েছিলেন।

সিঙ্গাপুর পতনের দু'দিন পরে ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ সালে বৃটিশ জেনারেল আর্চিবাল্ড পরিসিভাল ৪৫ হাজার ভারতীয় সেনাসহ জাপানের লে ঃ জেনারেল তোসোয়ুকি ইয়ামাসিতার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। জাপানি কর্তৃপক্ষের সহায়তায় এই সেনাদের নিয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আই এন এ) নামে এক সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন, যে সেনাবাহিনী বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে দেশের স্বাধীনতার জন্য ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের নির্দেশে। রাসবিহারী বসু তৎকালীন জাপান প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে আলোচনা করে জানান যে এই সেনাবাহিনীকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে জাপান সাহায্য করবে কিন্তু তাদের ওপর জাপানের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। রাসবিহারী বসু এই সেনাবাহিনী পরিচালনার ভার দেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং-কে।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা যেন রাসবিহারী বসুর প্রতিটি পরিকল্পনাকে পণ্ড করার জন্য বিধিনির্দিষ্ট ছিল। সামান্য ক্যাপ্টেন থেকে রাসবিহারী বসুর বদান্যতায় যিনি জেনারেল হয়েছেন সেই মোহন সিং বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন এবং বাহিনীকে ভেতর থেকে দুর্বল করার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং বৃটিশের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগও রাখতে শুরু করলেন। তবে পূর্বের ঘটনার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ রাসবিহারী বসু এবারে বিশ্বাসঘাতকটিকে সহজেই চিহ্নিত করতে পারলেন এবং ২৯ ডিসেম্বর ১৯৪২-এ তাকে পদচ্যুত ও বন্দি করলেন। কিন্তু বন্দি হবার পূর্বে তাৎক্ষণিকভাবে আই এন এ ভেঙে দিয়েছিলেন মোহন সিং। রাসবিহারী বসু অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই ভাঙা আই এন এ-কে আবার পুনর্গঠিত করলেন। এবং কর্নেল ভোঁসলে-কে নিযুক্ত করলেন নতুন আই এন এ-র নতুন কম্যান্ডিং অফিসার হিসেবে। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় এই অক্লান্ত পরিশ্রম করার ফলে তাঁর শরীর আরো ভেঙে যায় এবং তাঁর টিবি রোগ ধরা পড়ে। অথচ ভারতের বৃটিশরাজের ওপর নবগঠিত আইএনএ নিয়ে সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় তখন সমাগত।

অসুস্থ শরীর নিয়ে সে কাজ কীভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব? তাহলে কি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহালগ্ন শুধুমাত্র তাঁর অসুস্থতার জন্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে? এখানেই দেখা গেল রাসবিহারী বসুর মহত্ত্ব, নিজের হাতে গড়া আইএনএ-র নেতৃত্ব দেবার জন্য আহ্বান জানালেন সুভাষচন্দ্র বসুকে। তিনি তখন ছদ্মবেশে দেশত্যাগ করে জার্মানিতে অবস্থান করছেন। জার্মানিতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে ভারত অভিযানের লক্ষ্যে কিন্তু জার্মান ভারত ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে ব্যর্থমনোরথ হচ্ছেন। জার্মান জাপান যোগাযোগ ও পরিকল্পনা এবং চরমতম ঝুঁকি নিয়ে সুভাষচন্দ্রের সাবমেরিন যোগে জার্মানি থেকে জাপান আগমন ইত্যাদিতে কয়েকমাস কেটে গেল। ১৯৪৩ সালের ১ মে সাবমেরিন থেকে সুমাত্রায় অবতরণ করলেন সুভাষচন্দ্র, সেখান থেকে টোকিওতে বিমানযোগে পৌঁছলেন ১৬ মে। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করে তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে (তোজো জাপানি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কারও সঙ্গে কথা বলতেন না এবং দর্শনার্থীদের দোভাষীর সাহায্যও নিতে দিতেন না, তাই নেতাজীকে তোজোর সঙ্গে দেখা করার আগে কাজ চলা গোছের জাপানি ভাষা শিখে নিতে হয়েছিল— আপাতদৃষ্টিতে পরাজিত রাষ্ট্রনায়ক হলেও তোজোর এই মাতৃভাষা-প্রীতি সকলেরই শিক্ষণীয়) ২ জুলাই ১৯৪৩ সাল সিঙ্গাপুরে আসেন এবং ৪ জুলাই এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের হাতে নেতৃত্বভার তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানেই সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' নামে সম্বোধন করেন। দায়িত্বভার অর্পণের পরও রাসবিহারী বসু আরও দেড় বছর বেঁচে ছিলেন এবং সুভাষচন্দ্রকে সব ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন, সুভাষচন্দ্রও তাঁর সব পরামর্শ মেনে নিতেন এবং প্রয়োজনে নিজের সিদ্ধান্ত বদলও করতেন। তাঁর জাপান অবস্থানকালের তিন দশক (১৯১৫-১৯৪৫) তিনি প্রত্যেকদিন একটি ওক কাঠের ফলকের মাথায় বসে আরাধনা করতেন। সেই কাঠের ফলকে উৎকীর্ণ ছিল শ্রীশচন্দ্র ঘোষ-সহ তাঁর ১৪ জন সহযোদ্ধার নাম যাঁরা ১৯১৫-র আগে দেশে তাঁর পরিকল্পিত বিদ্রোহকে সার্থক করতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সহযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর কতটা আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ ছিল এই ঘটনা তারই প্রমাণ।

২১ জানুয়ারি ১৯৪৫ সালে টোকিও-য় নিজের বাসভবনে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর পাশে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বর্ণনা অনুযায়ী মৃত্যুর সময়ে তিনি নির্নিমেষ নয়নে চেয়েছিলেন সামনের দেওয়ালে টাঙানো 'বন্দেমাতরম্' লেখাটির দিকে।

কিন্তু আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকেরা কি পেরেছি তাঁর প্রতি সঠিক শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করতে? জাপানে থেকেও যিনি সারাজীবন ভারতের কথাই ভেবে গেলেন, ভারতের জন্যই প্রাণপাত করলেন তিনি 'ভারতরত্ন' হলেন না। কিন্তু জাপান সরকার তাঁকে জীবৎকালেই জাপানের শ্রেষ্ঠতম সম্মান 'Second order of the Merit of the Rising sun' দিয়ে ভূষিত করেছে। তাঁর মৃতদেহ বাহিত হয়েছিল রাজপরিবারের জন্য নির্দিষ্ট শবাধারে।

তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কোকি হিরোতা। উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান তোজো স্বয়ং। আর স্বাধীন ভারতবর্ষে রাসবিহারী বসুর জন্মশতবর্ষ (১৯৮৬) পালনে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো উদ্যোগই চোখে পড়েনি। ■

চিঠিপত্র

বাসিন্দা বাংলার, পোস্ট অফিস ঝাড়খণ্ডে

‘শিবঠাকুরের আপন দেশে নিয়মকানুন সর্বনেশে’ ছিল কবিতায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু বাংলার বাসিন্দাদের পোস্ট অফিস ঝাড়খণ্ডে— এমনটা বাস্তবে দেখে সত্যি সত্যি অবাক হতে হয়। আর এমনটাই রয়েছে বাংলায়। বীরভূম জেলার খয়রাসোল ব্লকের বনকাটা, ধাসুনিয়া ও শালজোড়— এই তিনটি গ্রামের পোস্ট অফিস বর্তমান ঝাড়খণ্ডের বাগ্‌ডহরী গ্রামে। জানা গেল, ১৯৫২ সাল থেকে ২০০৬ সালের ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত এই বাগ্‌ডহরী পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্টস্ অফিস ছিল বীরভূমের খয়রাসোলে। তারপর তা পাল্টে হয় ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া। কিন্তু বীরভূমের এই গ্রাম তিনটি আগের মতোই বাগ্‌ডহরী পোস্ট অফিসের অধীনেই রয়ে যায়। আর প্রশাসনিক পরিবর্তনের ফলে এই তিনটি গ্রামের ইন্টারভিউ লেটার থেকে সব রকম দরকারি চিঠিপত্র পৌঁছচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে— এমনটাই অভিযোগ বনকাটা গ্রামের শিক্ষিত তরুণ উত্তম দাসসহ এলাকার গ্রামবাসীদের। তাঁদের আরো অভিযোগ, চিঠিপত্র পেতে গেলে তাঁদের ইচ্ছে করেই ঝাড়খণ্ডের ঠিকানা দিতে হয়। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা দরবার করেছেন খয়রাসোল বিডিও, সিউড়ি হেড পোস্ট অফিস থেকে সাংসদ শতাব্দী রায় পর্যন্ত। এমনকী তাঁরা একটি নতুন পোস্ট অফিসের দাবিও জানিয়েছেন। কিন্তু সব মিলিয়ে এ সবের নীটফল এখনো জিরো। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ঝাড়খণ্ডের বাগডহরী পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার ভৈরবনাথ চৌধুরী, পোস্টম্যান গোঁসাইদাস গঁরাই ও জামতাড়া সাব্ ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর সিকান্দর প্রধান জানান, বীরভূমের ওই তিনটি গ্রামে তাঁদের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো রকম ঘাটতি নেই। তবে তাঁরা আলাদা পোস্ট অফিস চাইতেই পারেন। সেটা প্রশাসনিক ব্যাপার। সে যাই হোক, বাংলার এই তিনটি গ্রামের এখনো ঠিকানা ঝাড়খণ্ডের বাগ্‌ডহরী পোস্ট অফিস।

—উত্তম মণ্ডল,
রাজনগর (গৌরীবাগান) রাজনগর,
বীরভূম।

শঙ্খচিল

২ মে’র স্বস্তিকায় রঙ্গম বিভাগে বিকাশ ভট্টাচার্য স্বনামধন্য চলচ্চিত্রকার গৌতম ঘোষের সাম্প্রতিকতম ছবি ‘শঙ্খচিল’ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও প্রশংসা যথাযথভাবেই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর আলোচনাটি পড়লে অনেকেই এমন আদ্যন্ত বাঙালিমনস্ক ছবিটি দেখতে আকৃষ্ট হবেন। সেটিই কাম্য। তবে, এই প্রসঙ্গে ছোট একটি তথ্য প্রমাদ সংশোধন করে নিতে চাইব। গৌতম ঘোষের কিছু উল্লেখযোগ্য ছবির তালিকার মধ্যে ‘নিম অন্নপূর্ণা’ ছবিটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ‘নিম অন্নপূর্ণা’ পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ছবি। আর এই ছবির গল্পকার কমল মজুমদার বাংলা সাহিত্যের বহুল পঠিত না হলেও এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যতিক্রমী ধারার লেখক তা অনেকেই জানেন। শ্রী ঘোষও কমল মজুমদারের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত একমাত্র উপন্যাস অন্তর্জলিযাত্রা’ (প্রতিষ্ঠান- বিরোধিতা করে তিনি মূলত লিটিল ম্যাগাজিনেই লিখতেন)-কে সার্থক চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন। ছবিটিতে কপট শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের ভূমিকায় রবি ঘোষের অনবদ্য অভিনয় মনে পড়ে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী গৌতমবাবু তাঁর নিজের বহু ছবির আলোকচিত্রও নিজেই করেছেন। তাঁর প্রথম ছবি ‘মাভূমি’ (১৯৮০) তেলুগু হলেও তিনি অভিনেত্রী রেখাকে নিয়ে ‘যাত্রা’, একটি শিশুকেন্দ্রিক ছবি পতঙ্গ ও গুড়িয়া (অমর্ত্য সেন কন্যা নন্দনা অভিনীত) প্রভৃতি ভিন্নধারার হিন্দি ছবিও উপহার দিয়েছেন। অভিনয়ও করেছেন কয়েকটি ছবিতে। তবে তাঁর নিজের চোখে দেখা ও যৌবনের উন্মেষ লগ্ন থেকেই বাংলার বুকে ঘনিয়ে আসা নকশাল আন্দোলন নিয়ে ‘কালবেলা’র মতো ছবিতে তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ অনুভূত হয়।

—সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
শিবপুর, হাওড়া।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক বৃত্তান্ত

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস তাঁর নিবন্ধে (স্বস্তিকা, ১১.৪.১৬) প্রসঙ্গত বলেছেন--- একদা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্নে পদ্মফুল আছে বলে মুসলমান নেতৃবৃন্দ আপত্তি তুলেছিলেন। সেকালে আমি ওপার বাংলায় এক গ্রামের হাইস্কুলের ছাত্র। বিস্তারিত মনে

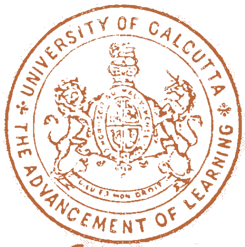

চিত্র-১

চিত্র-২

চিত্র-৩

নেই; এটুকু মনে আছে যে, শুধু পদ্মফুল নয়, প্রতীকে ‘শ্রী’ শব্দটি নিয়েও মুসলমান নেতৃবৃন্দের তীব্র আপত্তি ছিল। ওই ঘটনার কথা আজ আমাদের অনেকেরই অজানা।

'শ্যামাপ্রসাদ শতবর্ষ' উপলক্ষে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত (৪.৭.২০০১) 'শিক্ষা চিন্তার অন্যতম অগ্রপথিক শ্যামাপ্রসাদ' শীর্ষক নিবন্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও বিশিষ্ট গবেষক প্রয়াত দীনেশচন্দ্র সিংহ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা পুনরুল্লেখ করছি। আদিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে বৃটিশ রাজশক্তির চিহ্ন ছিল (চিত্র-১)। উপাচার্য থাকাকালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিন চার বছরের বিচারবিবেচনার পরও বাংলার বিশিষ্ট শিল্পীদের সুপারিশক্রমে প্রতীকের অভ্যন্তরস্থ চিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা হয়। বৃটিশ রাজশক্তির চিহ্ন অপসারণ করে সেখানে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বাংলা 'শ্রী' অক্ষর স্থাপন করা হয় (চিত্র-২)। ডিগ্রি ডিপ্লোমার শিরোদেশেও এই প্রতীক মুদ্রিত হয়। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো তুমুল কোলাহল। কেউ কেউ বললেন, এই প্রতীকে পৌত্তলিকতার ছাপ আছে এবং মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে নিদারুণ আঘাত লেগেছে। মুসলমান রাজনীতিক এবং ছাত্ররাও প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন।

কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের ডাক দিলেন; কেউ বা উৎসাহের আতিশয্যে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি তুললেন। ১৯৩৭ সালের সমাবর্তনে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় অভিভাষণ পাঠ করেন। কিন্তু 'শ্রী' ও পদ্মের উপর বিরূপ মুসলমান ছাত্ররা এই সমাবর্তন বর্জন করে। আমন্ত্রিত হয়েও বাংলার মুসলমান মন্ত্রী— ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন, সুরাবর্দি, আজিজুল হক সমেত কেউই সমাবর্তনে হাজির হননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বার্থে কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার সঙ্গে আপোশ করে 'শ্রী' অক্ষরটি তুলে দিলেন। সেই শূন্যস্থলে স্থাপন করলেন সূর্যরশ্মি, প্রস্ফুটিত পদ্ম ও পদ্মাকোরক (চিত্র-৩)।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যৎ

এখন সর্বত্র একটাই আলোচনার বিষয়— এই নির্বাচনে কে জিতবে? তৃণমূল বা কংগ্রেস কমিউনিস্ট জোট। তক্কাতক্কিতে কান ঝালাপালা। তর্কবাগীশ মহোদয়গণ হেলাফেলা কেউ নয়। কেউ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, কেউ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, কেউ ব্যবসায়ী।

গতকাল সন্ধ্যাবেলায় আড্ডার আসরের একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন--- 'আপনার কি মনে হয়?' আমি বললাম— 'এ বিষয়ে ইন্টারেস্ট নেই।' আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন প্রশ্নকর্তা। আমি বললাম— 'টু সাইডস অফ্ দ্য সেম কয়েন।' আরও বললাম— আমাদের সকলেরই আছে কাছে দেখার চশমা, দূরে দেখার চশমা নেই।

আমি উল্টে প্রশ্ন করলাম— পূর্ববঙ্গে অবিভক্ত বাংলায় তো কংগ্রেস, কমিউনিস্ট দল ছিল। এখন কি আছে? নেই কেন? পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হলো। যে যে জেলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়েছিল সেই জেলা পূর্বপাকিস্তান, তারপর বাংলাদেশ। সেই হিন্দু সংখ্যালঘু না আছে কমিউনিস্ট না আছে কংগ্রেস দল। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫২ সালের জনগণনায় ১৯.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে এখন হয়েছে ৩০ শতাংশ মুসলমান। কয়েক দশক পরে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হলে বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস। কমিউনিস্ট কি থাকবে?

—**কৃষ্ণকান্ত সরকার,**
কলকাতা-৫৫।

একশৃঙ্গী ইউনিকর্ণ বাস্তবে ঘোড়া

স্বনামধন্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশের অন্তর্গত লারকানা জেলার মহেনজোদাড়ো নামে এক স্থানে এক বিরাট ধ্বংসস্তূপের সন্ধান পান। সেই বছরই অপর প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ দয়ারাম সাহানি একই ধরনের ধ্বংসাবশেষ পাঞ্জাবের হরপ্পায় আবিষ্কার করেন। উল্লেখ্য, দেশ ভাগের সময় মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তদানীন্তন অধিকর্তা স্যার জন মার্শাল-এর তত্ত্বাবধানে উক্ত স্থান দুটিতে খননের কাজ শুরু হয়। এর ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে এক অতি প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার উদঘাটন হয়। সেখানে পাওয়া যায় সে যুগের মানুষের ঘরবাড়ি, দালান কোঠা, অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার, চিত্রাঙ্কিত মৃৎপাত্র, তাম্রপত্র, সিলমোহর ইত্যাদি। সিলমোহরে সবচেয়ে বেশি চিত্রিত পশুটি হলে একশৃঙ্গী ইউনিকর্ণ। ১৫২৪টি চিত্রিত পশুর মধ্যে ১১৫০ হচ্ছে ইউনিকর্ণ। উল্লেখ্য, বাস্তব জগতে একমুখী ইউনিকর্ণের অস্তিত নেই। ইংরেজি Unihorn শব্দ থেকে Unicorn নাম এসেছে। এরূপ পশুকে কিছু ঐতিহাসিক একশৃঙ্গী ষাঁড় মনে করেন। অন্য ইতিহাসবিদ্রা এটাকে অশ্ব বা ঘোড়া মনে করেন। ঘোড়ার মাথায় শিং কেন। তার উত্তর হয়তো জানা নেই। বিষয়টি নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করা থাক।

সাধারণভাবে ষাঁড়-গাভী, মহিষ, মেষ, ছাগল, গণ্ডারের মতো পশুদের মাথায় শিং থাকে। শিং দিয়ে আত্মরক্ষা বা আক্রমণ করা যায়। অর্থাৎ শিং হচ্ছে এক জাতীয় পশুদের প্রাকৃতিক অস্ত্র। ঘোড়া বলিষ্ঠ হলেও শৃঙ্গের অভাব হয়েছে। এরূপ অভাব দূর করার জন্য ঘোড়ার মাথার কৃত্রিম শিং পরানো হোত। ইউনিকর্ণের ছবি খুঁটিয়ে দেখলে বিষয়টি বোঝা যাবে। এছাড়া সিন্ধু সভ্যতায় তির ধনুক সহ দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট শিকারির মিল পাওয়া যায়। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সে যুগে কৃত্রিম শিংয়ের ব্যবহার ছিল। আলোচ্য ইউনিকর্ণ বা ঘোড়ার সামনে ত্রিকক্ষ বিশিষ্ট পাত্রাধার রাখা আছে। পাত্রাধারের একটি অংশ দণ্ড যার সঙ্গে দুটি পাত্র রয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে উপরের পাত্রে শুকনো বা ভেজানো পশুখাদ্য এবং নীচের পাত্রে জল বা পানীয় খাদ্য, রাখা হোত। সিন্ধু সভ্যতায় অশ্বের উপস্থিতি বৈদিক সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

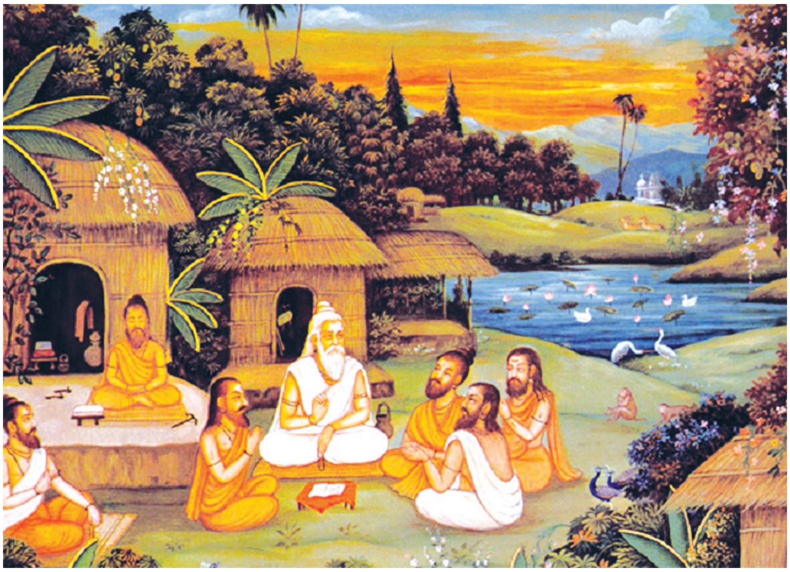

পরম্পরা

বেদশাখা

অমিত ঘোষ দস্তিদার

বিশ্বময় আলোচিত ও তর্কবিতর্কের ঝড়ে আন্দোলিত হওয়া সত্ত্বেও নিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ, অভ্রান্ত ও অলঙ্ঘ্য ভারতবর্ষের চিরন্তন মর্মবাণী আজও স্থির। প্রলয়ের আহ্বান যুগান্তকালে যখন ঘটতে থাকে, তখনও যে অপ্রকাশিত ও ধ্বংস বিমুখতায় থাকার ক্ষমতা রাখে, যুগপ্রারম্ভে পুনরায় যাকে তপস্যা দ্বারা লাভ করা যায় তাই হলো বেদ।

বৈচিত্র্যময় স্তম্ভিত বহুবিবিধতা নিয়ে সুদূর অতীতের রহস্যময় নিভৃতে সদা জাগ্রত থেকে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রথম উৎসারিত হয়ে যে সাহিত্য সুপ্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারকে গর্বিত করেছিল, সন্দেহাতীত ভাবে তার সঠিক নির্ণয় করার উপযুক্ত উপাদান বহু মাথা ঠুকেও আজ পর্যন্ত কেউই সংগ্রহ করতে পারেনি।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে ম্যাক্সমূলার, অধ্যাপক এইচ জ্যাকবি, অধ্যাপক ম্যাকডোনেল, জার্মান পণ্ডিত ভিন্টারনিটস্, হুগো উইঙ্কলার, এম. উইনটারনিট্জ, থিবো এবং ভারতীয় পণ্ডিত অধ্যাপক ড. অবিনাশচন্দ্র দাস, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, আর. সি. মজুমদার প্রমুখ বিরুদ্ধ মনোভাবের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বতন্ত্রভাব ব্যক্ত করে গেছেন।

বেদ সম্পর্কীয় তর্কবিতর্ক খৃষ্ট পূর্ব ৬০০০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ৫০০ পর্যন্ত ঘোরাফেরা করে ক্লান্ত হলেও আজ পর্যন্ত সঠিক সময় নির্ধারণ কেউই করে যেতে পারেননি। ভবিষ্যতে কেউ পারবেন কিনা তা ভবিষ্যৎকালের জন্যই তোলা থাক।

বেদ কবেকার— এই প্রশ্নের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ বেদ হলো একটি সম্পূর্ণ যুগ। শুধুমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতি নয়, বিশ্বসংস্কৃতির একটি সম্পূর্ণ যুগ। যে যুগ জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন করেছে এমন একটি শব্দ, যার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হলো জ্ঞান। এই জ্ঞান হলো অতীন্দ্রিয়। কারণ এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা লাভ করা যায় না। এই জ্ঞান হলো ভারতবর্ষের চিরন্তন মর্মবাণী। মনুর মতে, বেদই হলো সমস্ত ধর্মের মূল। এখানে ধর্ম অর্থে, বর্তমানকালে ধর্ম অর্থে যা বুঝি তা নয়। বর্তমানকালে ধর্ম অর্থে আমরা যা বুঝি তা হলো ইংরেজি রিলিজিয়ান। এটা একটা মারাত্মক ভুল। বেদের ধর্ম অর্থ সংস্কৃত বা প্রাক্ সংস্কৃত থেকে এসেছে। ওই শব্দের অর্থ হলো— যা না থাকলে সে থাকে না, সেটাই তার ধর্ম— যে জিনিসটা না থাকলে বস্তুটাই থাকে না, মোটামুটি সেটাই তার ধর্ম— এটাই ধর্ম কথার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। ইংরেজিতে একে বলে essential property বা inherent quality।

নিত্য-স্বতঃসিদ্ধ-অভ্রান্ত-অলঙ্ঘ্য-সনাতন- অপৌরুষেয় ভাবে স্বয়ং প্রকাশিত পরব্রহ্মের নিঃশ্বাস অবলীলাক্রমে প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রকাশ হলো মহৎ সত্যের দ্যোতক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়— 'যেন একটি আকস্মিক অলৌকিক আবির্ভাবের মতো, তাহা কবির আয়ত্তের অতীত'।

শ্রবণ পরম্পরাচক্রে বেদের জ্ঞান বিধৃত বলে তার নাম 'শ্রুতি'। শ্রুতির মাধ্যমে বেদমন্ত্র লাভ করতেন যাঁরা তাঁদের বলা হোত 'শ্রুতর্ষি'। ঋষিগণ ছিলেন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা, মন্ত্রের স্মরণকর্তামাত্র। বৈদিকমন্ত্রের তিনটি রূপ— পদ্য, গান, গদ্য। পদ্যাত্মক মন্ত্র ঋক্, গীতিরূপ মন্ত্র সাম এবং গদ্যাত্মক মন্ত্র যজুঃ। তাই বেদের আর এক নাম ত্রয়ী। বেদের অংশ দুটি— মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। নিরুক্তকার যাস্কের মতে 'মন্ত্রাঃ মননাৎ' অর্থাৎ মন্ত্র হলো মননসাপেক্ষ। মন্ত্রের তিনপ্রকার বিভাগ— পরোক্ষকৃত, প্রত্যক্ষকৃত এবং আধ্যাত্মিক। দেবতাকে পরোক্ষভাবে প্রথম পুরুষে উল্লেখ করার স্তুতিমাধ্যম মন্ত্র হলো পরোক্ষকৃত মন্ত্র। দেবতাকে প্রত্যক্ষভাবে মধ্যমপুরুষে সম্বোধনমূলক স্তুতি মাধ্যম হলো প্রত্যক্ষকৃতমন্ত্র। উত্তমপুরুষ— দেবমাহাত্ম্য কীর্তিতমন্ত্রমাধ্যম হলো আধ্যাত্মিক মন্ত্র। মন্ত্র অংশ গদ্যে-পদ্যে-গানে ব্যক্ত।

ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে প্রকাশিত যজ্ঞানুষ্ঠান বিধি-মন্ত্র বিনিয়োগকৃত বিবরণ। বর্তমানকালে ওই দুই ভাগকে চারটি

শ্রেণীতে পরিণত করা হয়েছে— মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষৎ।

মন্ত্রসমষ্টি হলো সংহিতা, অর্থাৎ সংগ্রহ। সংহিতা হলো চারটি— ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব। প্রত্যেক সংহিতার সঙ্গে এক বা একাধিক ভাবে যুক্ত অংশ হচ্ছে ব্রাহ্মণ। প্রত্যেক মহাব্রাহ্মণাত্মক বেদের সঙ্গে আরণ্যক এবং উপনিষৎ নামের দুই শ্রেণীর গ্রন্থ যুক্ত, যাকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়।

পুরাণগুলিতে যা বলা হয়েছে এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বেদের শাখা গণনা করবার সময় যে মত গ্রহণ করেছেন তা হলো— ঋগ্বেদের একুশটি শাখা, যজুর্বেদের একশত শাখা, সামবেদের এক সহস্র শাখা এবং অথর্ববেদের নয়টি শাখা। বিভিন্ন সংহিতা সম্বন্ধে বিভিন্ন সংখ্যক শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে বৈদিক গ্রন্থে এবং বেদ পরবর্তী গ্রন্থে ঋগ্বেদের শাখা সংখ্যা বিভিন্নভাবে কখনও ত্রিশেরও অধিক, কখনও চব্বিশ, কখনও একুশ, কখনো বা পনেরো বলা হয়েছে। 'চরণব্যূহ' নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ঋগ্বেদের পাঁচটি শাখার নাম পাওয়া যায়। ওই নামগুলি হলো— শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন এবং মাণ্ডূক।

বিষ্ণু পুরাণের মতে ব্যাসদেবের নিকট সামবেদ শিক্ষা করেন ব্যাসশিষ্য জৈমিনি। জৈমিনির কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেন জৈমিনিপুত্র সুমন্ত। সুমন্তের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেন তাঁর পুত্র সুকর্ম। সুকর্ম তাঁর শিষ্যদের সামবেদ শিক্ষা দেন। সামবেদের সহস্র শাখার কারণ হলো সামগানের সহস্রাবিধ রীতি। চরণব্যূহ গ্রন্থে মহর্ষি শৌনক সামবেদের সাততি শাখার উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে সামবেদের মাত্র তিনটি শাখা পাওয়া যায়— কৌথুম, জৈমিনীয়, রাণায়নীয়। চরণব্যূহ গ্রন্থকার শৌনক যজুর্বেদের ছিয়াশিটি শাখা ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রাচীন পুরাণ সমূহে যজুর্বেদের শতাধিক শাখা ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শৌনক কৃষ্ণযজুর্বেদের সাতাশটি এবং শুক্লযজুর্বেদের ষোলটি মোট তেতাল্লিশটি শাখার নাম উল্লেখ করেছেন। কালপ্রবাহে অধিকাংশই বিলুপ্ত। বর্তমানকালে যজুর্বেদের মাত্র পাঁচটি শাখা প্রচলিত আছে; সেগুলি হলো— কৃষ্ণযজুর্বেদের তিনটি শাখা, যথা— তৈত্তিরীয়, মৈত্রায়ণী এবং কঠ। শুক্লযজুর্বেদের দুটি শাখা, যথা— মাধ্যন্দিন এবং কাণ্ব।

নর্মদা নদী প্রাচীনকালে ভারতের উত্তর এবং দক্ষিণের মধ্যবর্তী বিভাজন রেখা বলে গণ্য হোত। নর্মদার দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতে ঋগ্বেদের আশ্বলায়নী শাখা, কৃষ্ণযজুর্বেদের আপস্তম্বীশাখা, সামবেদের রাণায়নী শাখা ও অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখা প্রচলিত ছিল। আর নর্মদার উত্তর দিকে বা উত্তর ভারতে ঋগ্বেদের শাঙ্খায়নী শাখা, শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখা, সামবেদের কৌথুমী শাখা ও অথর্ববেদের শৌনক শাখা প্রচলিত ছিল।

প্রাচীনকালে বেদপাঠ খুব কঠিন ছিল। উচ্চারণ এবং স্বরগুরুত্ব ও চিহ্নজ্ঞান ছিল বেদপাঠের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সংহিতাপাঠ-সহ মোট এগারো প্রকারের পাঠ ছিল। এই এগারো প্রকার পাঠ আবার দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সেই দুই ভাগ হলো, প্রকৃতিপাঠ এবং বিকৃতিপাঠ। প্রকৃতিপাঠ হলো তিন প্রকার, যথা— সংহিতাপাঠ, পদপাঠ, ক্রমপাঠ। বিকৃতিপাঠ হলো আট প্রকার, যথা— জটপাঠ, মালাপাঠ, লেখাপাঠ, শিখাপাঠ, ধ্বজপাঠ, দণ্ডপাঠ, রথপাঠ এবং ঘনপাঠ। বেদের অর্থ সহজ করার ব্যবস্থাই হলো এই পাঠ বিভাগ। বেদের অর্থবোধের সুবিধার জন্য গ্রন্থ হলো বেদাঙ্গ নিরুক্ত। বৈদিক যুগেই ছয় শ্রেণীর বেদাঙ্গ ছিল। নিরুক্তগ্রন্থকার যাস্ক-এর পূর্ববর্তী কিছু নৈরুক্ত আচার্য ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন— ঔদুম্বরায়ণ, ঔর্ণবাঙ, শাকটায়ন, কৌৎস ও শাকপূর্ণি। আরও পরে বেদের ধারাবাহিক ব্যাখ্যা এবং ভাষ্য রচনায় বেশকিছু বেদবিদ্ পণ্ডিত ভাষ্যকার রূপে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। বেদের প্রাচীনতম অংশ ঋক্ সংহিতার ভাষ্যকার ছিলেন— স্কন্দস্বামী, কপর্দিস্বামী, ভরতস্বামী, ভট্টভাস্করনারায়ণ, বেঙ্কটমাধব প্রমুখ। চতুর্দশ শতাব্দীতে বিজয়নগরের অধিবাসী আচার্য সায়ন ছিলেন সমগ্র বেদের জনপ্রিয় ভাষ্যরচয়িতা।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে যাঁরা বেদ নিয়ে গবেষণা, দার্শনিক ব্যাখ্যা, প্রতীকী ব্যাখ্যা করে গেছেন, তাঁরা হলেন ভারতের আর্যসমাজের পুরোধা স্বামী দয়ানন্দ, মহারাষ্ট্রের বেদজ্ঞ পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক, প্রতীকী ব্যাখ্যাকার শ্রী অরবিন্দ, আধ্যাত্মিক বেদব্যাখ্যাকার শ্রী অনির্বাণ। পাশ্চাত্যের বেদজ্ঞরা হলেন— রুডলফ্ রথ, জার্মান পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গ, জার্মান পণ্ডিত কারেগি, ভিস্টারনিট্স প্রমুখ। মানবজাতি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গের সন্ধান যে অলৌলিক জ্ঞানপীঠ- অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সত্যদ্রষ্টাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে, তা চিরন্তন করে রাখার জন্য কামনা করি— 'আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতঃ'— আমাদের মধ্যে সকল শুভচিন্তার উদয় হোক। তবেই প্রাচীন ঋষিদের উত্তরপুরুষের জন্য চিরন্তন সত্যের সযত্ন সাধনা সার্থক হয়ে উঠবে এবং যুগ থেকে যুগে সংরক্ষিত হয়ে থাকবে। ■

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

কেরালার পোঙ্গল মহোৎসব

ভারতবর্ষ এমন এক স্থান যেখানে মানুষ কখনও দেবতার স্তরে উন্নীত হয় বা দেবতা কখনও মানুষে। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে ভারতের শেষ ভূখণ্ড পর্যন্ত তার প্রচুর নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তা হাজার হাজার বছরের পৌরাণিক ইতিহাস গাথার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

কেরালার এমনই এক জনপ্রিয় এবং প্রাচীন গাথা 'কন্নগী চরিতম্' বা তামিল কবি ইল্লানগোর মহাকাব্য 'সিলপতিকিরম্'। উভয় গাথাই রচিত কিংবদন্তী তামিল ব্যক্তিত্ব কন্নগীর ভালোবাসা, মহানুভবতা, তিতিক্ষা ও সাহসিকতা নিয়ে।

কাবেরীপত্তিনমের ধনী ব্যবসায়ী কোভালনের সঙ্গে বিয়ে হয় সুন্দরী কন্নগীর। দাম্পত্য জীবন তাঁদের বেশ ভালোই চলছিল। কিন্তু এক সময় কোভালনের জীবনে নর্তকী মাধবীর প্রবেশ ঘটে। মাধবীর মোহে কোভালন কন্নগীকে ভুলে বসে এবং সমস্ত সম্পদ ওই নর্তকীর জন্য ব্যয় করে। অন্যদিকে, নিজের ভালোবাসার মানুষটিকে পর হতে দেখেও বুকে পাথর চেপে নীরব থাকেন কন্নগী। অবশেষে সবকিছু হারিয়ে যখন কোভালন কন্নগীর কাছে ফিরে আসেন, তখন তাদের সম্পদ বলতে অবশিষ্ট ছিল একজোড়া চিলাম্ভু অর্থাৎ নূপুর। কন্নগী স্বেচ্ছায় তা কোভালনকে দেন হৃত ধনসম্পদ পুনরায় অর্জন করার জন্য। এরপর তাঁরা ভাগ্যান্বেষণে মাদুরাই শহরে যাত্রা করেন। তখন মাদুরাইয়ের শাসক ছিলেন পাণ্ড্য রাজা প্রথম নিদুঞ্জ চেলিয়ান। সেখানে এসে কোভালন ওই নূপুর জোড়ার একটিকে স্বর্ণকারের কাছে বিক্রি করতে গেলে সে তাঁকে রাজার কাছে নিয়ে যায়। কারণ ঠিক সেই সময়েই রানির ওই রকমেরই একটি নূপুর খোয়া গিয়েছিল। তাই স্বর্ণকার ওই নূপুরটিকে রানির ভেবে বসে। রাজা তখন আগে পরে কিছু না ভেবে নিরপরাধ কোভালনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বসেন। শোকে, দুঃখে কাতর কন্নগী তখন রাজদরবারে অপর নূপুরটি নিয়ে এসে প্রমাণ করেন রাজার বিচার সঠিক নয়। তাঁর নূপুর ছিল চুনি খচিত আর রানিরটা মুক্তোর। শোকাতুরা কন্নগী অভিশাপ দেন যে সমগ্র শহর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এরপর রাজা রানি দু'জনেই মারা যান।

এই ঘটনার স্মরণে আজও কেরালায় পালিত হয় পোঙ্গল মহোৎসব। রাজধানী তিরুবনন্তপুরমে কন্নগীর স্মরণে প্রতিষ্ঠিত হয় অত্তুকল ভগবতী মন্দির। কন্নগীর কর্ম তাঁকে দেবীর স্তরে উন্নীত করেছে। আজ লক্ষ লক্ষ নারী ভগবতীরূপী কন্নগীর পূজা করতে প্রতি বছর এখানে জমায়েত হয়। পরিবারের জন্য শ্রী ও সমৃদ্ধি কামনা করে প্রার্থনা করেন তাঁরা। মালায়ালম মকরম অথবা কুম্ভকম্ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) মাসের কৃত্তিকা নক্ষত্রে দশদিনের এই মহোৎসব শুরু হয়। এর নবম দিনে অনুষ্ঠিত হয় পোঙ্গল উৎসব। বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে কোটি কোটি রমণী এদিন মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। এবং নিজের সঙ্গে আনা মাটির হাঁড়িতে গুড়, নারিকেল সহযোগে মিষ্টি ভাত রান্না করেন। দুপুরের মধ্যে পোঙ্গল তৈরি হয়ে গেলে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দেবীর তরবারি হাতে মন্দির থেকে বের হয়ে এসে পোঙ্গলের উপর পবিত্র জল এবং ফুল ছিটিয়ে দেন। এরপর সেই পবিত্র প্রসাদ সকলে বাড়ি নিয়ে যান। ১৯৯৭ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি মন্দির প্রাঙ্গণে সর্বাধিক নারীর জমায়েত হয় যা গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে বৃহত্তম জমায়েত হিসাবে নথিভুক্ত হয়। সেবছর ১৫ লক্ষ নারী পরিবারের মঙ্গল কামনায় পোঙ্গল মহোৎসবে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই উৎসব অবিচারের উপর ন্যায় প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান। দশদিন ব্যাপী ভাবগম্ভীর পরিবেশে দেবীর পূজা হয়ে থাকে।

'কন্নগী চরিতম্' পাঠ করার পাশাপাশি ভজন, গীতিনাটিকাও অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান চলাকালীন শোভাযাত্রা বের হয়। অন্তর দিয়ে অনুভব করলে বোঝা যাবে এই অনুষ্ঠান মানুষের সঙ্গে দেবতার ওতপ্রোত সম্পর্কের এক প্রতীকী অনুষ্ঠান। ■

কচ ও শুক্রাচার্য

দেবতাদের সময়টা মোটেই ভাল যাচ্ছে না। অসুরদের সঙ্গে তাঁরা কিছুতেই যুদ্ধে পেরে উঠছেন না। অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য এক আশ্চর্য বিদ্যা জানেন, সঞ্জীবনী বিদ্যা। যা দিয়ে তিনি যুদ্ধে মারা যাওয়া অসুরদের বাঁচিয়ে তোলেন। ফলে দেবতারা যাকেই মারেন শুক্রাচার্য তাকেই বাঁচিয়ে তোলেন। এ তো মহা বিপদ, কি করা যায়! কী করে শেখা যায় সেই বিদ্যা। তখন সব দেবতারা এলেন দেবগুরু বৃহস্পতি- পুত্র কচের কাছে। অনুরোধ করলেন কচ যেন শুক্রাচার্যের শিষ্য হয়ে সেই বিদ্যা শিখে আসে।

কচ খুব ভাল ছেলে। সে দেবতাদের কথা মেনে নিয়ে চলে এলো অসুর গুরু শুক্রাচার্যের কাছে। শুক্রাচার্যকে প্রণাম করে বলল— আমি আপনার শিষ্য হতে চাই। কচকে দেখে শুক্রাচার্যের খুব ভাল লেগে গেল। তিনি বললেন— ঠিক আছে তুমি আমার কাছে ব্রহ্মচারী হিসেবে থাকো। তোমার কাজ আমার আশ্রমের কাজ করা। কচ সেই মতো বনে বনে গোরু চরায়। শুক্রাচার্যের মেয়ে দেবযানীর পূজার ফুল তুলে দেয়। ফলে দেবযানীরও খুব প্রিয় হয়ে উঠলো কচ। এইভাবেই দিন চলতে লাগলো।

কিন্তু কচের এই শিষ্যত্ব গ্রহণ মোটেই ভালো চোখে দেখলো না অসুররা। তারা বুঝতে পেরে গেছে কচ সঞ্জীবনী মন্ত্র শেখার জন্যই গুরু শুক্রাচার্যের কাছে এসেছে। গোপনে তারা ষড়যন্ত্র করতে লাগলো কীভাবে কচকে মেরে ফেলা যায়। দুবার তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করল কিন্তু দুবারই শুক্রাচার্য বাঁচিয়ে তুললেন। তারপর একদিন বনে গোরু ছেড়ে দিয়ে কচ ঘুমোচ্ছিল, সেই সময় অসুররা তাকে আক্রমণ করলো। অসুরদের সঙ্গে একা যুদ্ধে পেরে উঠলো না কচ। অসুররা তাকে মেরে ফেলল এবং তার দেহটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল। তারপর সেই ছাই এনে মিশিয়ে দিল গুরু শুক্রাচার্যের সুরার সঙ্গে। শুক্রাচার্য অসুরদের গুরু, তাই তাঁর সুরাপানের অভ্যাস আছে। শুক্রাচার্য সেই সুরা পান করলেন।

এদিকে সন্ধ্যে হয়ে গেছে কচ আশ্রমে ফেরেনি। দেবযানী খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো। কচের কোনো বিপদ হলো না তো? এই ভেবে সে শুক্রাচার্যের কাছে ছুটে এলো। সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে কচকে ফিরিয়ে আনার জন্য বলতে লাগলো। কচের যদি মৃত্যুও হয় তবু সে বেঁচে ফিরে আসবে। মেয়ের আকুতি শুনে শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রয়োগ করলেন। কিন্তু কচ কিছুতেই ফেরে না। অনেকক্ষণ পর কচের কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল। শুক্রাচার্যের পেটের ভিতর থেকেই সেই আওয়াজ আসছে। শুক্রাচার্য বললেন—কচ তুমি আমার পেটের ভিতর কী করে এলে? কচ তখন সব বৃত্তান্ত খুলে বলল। দেবযানী ব্যাকুল হয়ে উঠলো, কচকে বাঁচাতেই হবে। শুক্রাচার্য বললেন— কচ যদি বাঁচে সে আমার পেট ফেটে বেরোবে। তাতে তো আমি মারা যাবো। কিন্তু একটা তো কিছু করতেই হবে। শুক্রাচার্য তখন কচকে সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। কচ পেটের ভিতর থেকে সে বিদ্যা শিখে নিল। তারপর শুক্রাচার্য কচকে সঞ্জীবনী বিদ্যা বলে বাঁচিয়ে তুললেন। গুরুদেবের পেট ফেটে বেরিয়ে এলো কচ। এবং সদ্য শেখা মন্ত্র বলে সে আবার তার শুক্রাচার্যকে বাঁচিয়ে তুলল।

উদ্দেশ্য সফল করে কচ আবার স্বর্গে ফিরে গেল।

রাজ্য পরিচিতি

মধ্যপ্রদেশ

বর্তমান মধ্যপ্রদেশ রাজ্য ১৯৫৬ সালে গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে আগের মধ্যপ্রদেশের ১৭টি হিন্দীভাষী জেলা, আগের মধ্যভারত রাজ্য, আগের বিন্ধ্যপ্রদেশ, আগের দেশীয় রাজ্য ভোপাল এবং রাজস্থানের কোটা জেলার সিরোঞ্জ মহকুমা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর উত্তরে উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমে গুজরাট ও রাজস্থান, দক্ষিণে মহারাষ্ট্র এবং পূর্বে ছত্তিশগড় রাজ্য। আয়তন ৩ লক্ষ ৮ হাজার ২৪৫ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৭ কোটি ৯৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৮৭ জন। ভাষা হিন্দী। রাজধানী ভোপাল। রাজ্যে ২৩টি জেলা জনজাতি বহুল। প্রধান ফসল জোয়ার, গম, ধান, ছোলা। লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, কয়লা, চুনাপাথর ও টিন প্রধান খারিজ দ্রব্য। বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপকরণ নির্মাণে মধ্যপ্রদেশ ভারতের মধ্যে অগ্রগণ্য।

খাজুরাহো মন্দির বিশ্বের প্রসিদ্ধ পুরাতাত্ত্বিক মন্দির। উজ্জয়িনী, মহাকালেশ্বর, সাঁচীর বৌদ্ধস্তূপ, গোয়ালিয়রের দুর্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্রাট বিক্রমাদিত্য, কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস, বাণভট্ট, বরাহমিহির, রাজাভোজ, সঙ্গীত সম্রাট তানসেনের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এ রাজ্যেই জন্মগ্রহণ করেন। রানি অহল্যাবাঈ, রানি দুর্গাবতী, রানি লক্ষ্মীবাঈ-য়ের মতো মহীয়সী ও বীরাঙ্গনা এই রাজ্যেই জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্নবাণ

১. মার্ক জুকারবার্গ কোন্ দেশের নাগরিক?

২. শান্তিনিকেতন পশ্চিমবঙ্গের কোন্ জেলায়?

৩. 'আইস হকি' কোথাকার জনপ্রিয় খেলা।

৪. পূর্ণকুম্ভ কত বছর অন্তর হয়ে থাকে?

৫. 'দেনা-পাওনা' উপন্যাস কার লেখা?

উত্তর : ১. জার্মানি। ২. বীরভূম। ৩. কানাডা। ৪. ১২ বছর। ৫. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ছবিতে অমিল খোঁজ

ছোটদের কলমে

রবিঠাকুর

সুমনা সাহা, সপ্তম শ্রেণী

দেশ বিদেশে দিকে দিকে
রবি ঠাকুরকে সবাই চেনে,
সাদা জামা সাদা দাড়ি
যেন কোনো ঋষি মুনি।

কলমে মা সরস্বতী
বিদ্যে বুদ্ধির নেইকো জুড়ি,
ছোট বড় সর্বজনে
মানে তাঁকে বড় গুণী।।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

সন্তান প্রতিপালনে মায়েদের সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন

সুতপা বসাক ভড়

সম্প্রতি বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা চলছে, কিছু কিছু ভালো ফলও আসতে শুরু করেছে। আমরা সবাই জানি যে, এই ধরনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র খুবই কঠিন ও জটিল হয়। তাই খুবই সাবধানে এই পরীক্ষাগুলি দিতে হয়।

ছেলেমেয়েরা সাধারণত দু'বছর কঠোর পরিশ্রম করে থাকে ওই ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার বা ভাল নম্বর পাবার জন্য। এর সঙ্গে তারা বোর্ডের জন্যও তৈরি হয়। কিন্তু সবসময় তাদের মনোমত ফল হয় না। আর এটাই স্বাভাবিক। আমরা তো সব ব্যাপারেই কত চেষ্টা করে থাকি, কিন্তু সবসময় যা চাই তা পাই না। সেটা সম্ভবও নয়। জীবন আমাদের চাওয়া-পাওয়ার হিসাবে চলে না। কখনও ভালয়, কখনও মন্দে। অথচ এসবকিছু আমরা ভুলে যাই নিজের সন্তানের ক্ষেত্রে। আমরা তাদের যা-যা সুবিধা দিই, সেগুলি পুরোপুরি ফেরত পেতে চাই। অনেক সময় আমাদের চাহিদা তার থেকেও বেশি থাকে। এ যেন লগ্নি করেছি, এবার সুদে-আসলে দাও। অনেক মা-বাবা সন্তানদের নামি-দামি কোচিং সেন্টারে ভর্তি করিয়ে দিয়ে ভাবেন, গাছ লাগিয়েছি, দু' বছর পরেই ফল পেয়ে যাব। বিত্তবানেরা রাজস্থানের কোটাতে ছেলেমেয়েদের পড়তে পাঠান। তবে পয়সার হিসাব এঁরা সবাই রাখেন। মা-বাবারা নিজেদের অপ্রাপ্তির ক্ষোভ মেটাতে চান নিজেদের সন্তানদের মধ্যে দিয়ে। নিজেদের অসফলতা চূড়ান্ত সফল হয়ে সন্তানাদির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করুক— এই ইচ্ছা বেশিরভাগ অভিভাবকের। কিন্তু একবার ওইসব অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের কথা ভাবুন। প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থাকে তারা। একদিকে, বেড়ে চলা পড়াশুনার বোঝা, অপরদিকে মা-বাবাদের প্রত্যাশা।

আমরা ভুলে যাই যে, ছেলেমেয়েরা রোবট বা মেশিন নয়— মানুষ। অনেক বাড়িতে পড়াশুনার খরচের কথা বারবার বলা হয়, এতে তারা কষ্ট পায়। তারা নিজেরাও জানে যে, মা-বাবা তাদের পড়াশুনার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করছে, চিন্তা করছে। একথা সবসময় মুখে না বললেও বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরা এটা ভাবে— সেই মতো যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আমাদের বোঝা উচিত যে, মোটামুটি সব ছেলেমেয়েই গড়ে একইরকম মেধাবী হয়, তাদের মধ্যে যারা নিয়মিতভাবে কঠোর পরিশ্রম করে, তারাই সফল হয়। আমরা গোটা বছর তাদের দেখাশুনা করব না, কেবলমাত্র পরীক্ষা আর রেজাল্টের সময় বকাবকি করব, এটা তো ঠিক নয়। এর ওপর শুরু হয়েছে কোচিং সেন্টারের রমরমা ব্যবসা। তারা এমনভাবে বিজ্ঞাপন দেয়, যেন তাদের কাছে লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয় করলেই ছাত্রছাত্রীরা সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবটা সম্পূর্ণ পৃথক। যেসব ছেলেমেয়ের নাম, ছবি দিয়ে ওরা বিজ্ঞাপন দেয়, তাদের সংখ্যা ওই কোচিংয়ের ওই বছরের মোট বিদ্যার্থী সংখ্যার মধ্যে খুবই নগণ্য। কোচিং সংস্থাগুলি মেধাবী বিদ্যার্থীদের ওপর বেশি যত্ন নেয়। মাঝারি বা দুর্বল বিদ্যার্থীদের জন্য থাকে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের শিক্ষকমণ্ডলী এবং শিক্ষণ ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে বিদ্যার্থীরা কোচিং কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানালে, চণ্ডীগড়ের একটি নামি কোচিং সংস্থার ডিরেক্টর বলেন, "তোমরা মেধাবী হয়ে যাও, তখন তোমাদেরও আমরা আলাদা করে বেশি গুরুত্ব দেব।" হতাশ হয়ে তারা ফিরে আসে। মেধা তো নিক্তিতে মেপে ঠিক করা যায় না, অথচ মোটা অঙ্কের অর্থ সবাই দিচ্ছে।

কোচিং সংস্থাগুলি নির্মমভাবে ছেলেমেয়েদের ওপর মানসিক অত্যাচার করে। আমার পরিচিত এক কিশোরী কোটার একটি বিখ্যাত কোচিং সেন্টার ছেড়ে হঠাৎ বাড়ি ফিরে আসে। এসে বলে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভৎর্সনা করে বলেছে, 'যাও, সব চম্বলমে কুঁদ মরো'। চম্বল একটি নদীর নাম। এবার ওই মেয়েটি কঠোর পরিশ্রম করে বাড়িতে পড়াশুনা করে আই আই টি, কানপুর থেকে পাশ করে বর্তমানে সামসং ব্যাঙ্গালুরুতে কর্মরতা। তার পড়াশুনাতে তার মার ভূমিকা ছিল অসাধারণ।

একটি পরিসংখ্যানে জানা যায়— প্রতি বছর ১.৫ লক্ষ বিদ্যার্থী কোটাতে পড়তে যায়। সেখানে চল্লিশটি বড় কোচিং সংস্থা আছে। দু' হাজার কোটি টাকার কোচিং ব্যবসা চলে। দুঃখের কথা, এখানে ২০১৫-তে তিরিশ জন এবং এবছর পাঁচজন বিদ্যার্থী আত্মহত্যা করেছে মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে। কোটার জেলা কালেক্টর (ডি.সি.) রবিকুমার সুরপুর অভিভাবকদের কাছে আন্তরিক আবেদন জানিয়েছেন, তাঁরা যেন ছেলেমেয়েদের ওপর চাপ না দেন।

ছেলেমেয়েরা বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে থেকে বিদ্যালয় বা স্থানীয় শিক্ষকের সহায়তায় অনেক ভালভাবে ওই পরীক্ষাগুলির জন্য প্রস্তুত হতে পারে। তাছাড়া, আজকাল ইন্টারনেটের যুগ, শতকরা আটানব্বই থেকে নিরানব্বই শতাংশ পড়াশুনা সংক্রান্ত সাহায্য সেখান থেকে পাওয়া যায়। সুতরাং মায়েরা যদি একটু সংবেদনশীল হয়ে ভালবেসে আমাদের সন্তানদের পথ নির্দেশ করার চেষ্টা করি, তাহলে তাদের মানসিক চাপ অনেকটাই কম হবে। নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, তারা ভাল ফল করবে। সন্তানের মঙ্গলকামনায় মায়েদের সক্রিয়ভাবে তাদের পাশে থাকা একান্ত প্রয়োজন। ■

সেই আশ্চর্য বৃদ্ধি আবার ফিরে আসবে

মোদী সরকারকে এক প্রতিবন্ধী উত্তরাধিকারের সঙ্গে দু’ বছর লড়াই চালাতে হচ্ছে

অতিথি কলম

অরবিন্দ পানাগড়িয়া

সরকার গঠনের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদযাপনের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গেই ত্বরান্বিত হবে সরকারের কাজকর্মের মূল্যায়নের প্রসঙ্গও। তবে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু করতে গেলে প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে শুরু করার টাচ লাইনটা। আর সেই প্রারম্ভিক রেখাকে ধরেই যা কিছু অগ্রগতি তার হিসেব নিকেশ হতে পারে।

স্মরণে রাখতে হবে ২০০৪ সালে এনডিএ সরকার নির্বাচনে হারার পর নতুন ইউপিএ সরকারকে যে অর্থনীতির ভাঁড়ার হস্তান্তর করে যায় যেখানে তখনকার অর্থনৈতিক বছরের হিসেব অনুযায়ী বৃদ্ধির শতাংশ ছিল ৮.১। পরবর্তী ১০ বছর অর্থাৎ মে ২০১৪ অবধি ছিল ইউপিএ-এর শাসন। আর এই শাসনভার ২০১৪ সালে হস্তান্তরের সময় বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছিল কেবল ৫ শতাংশ। চলতি সরকারের নতুন ফর্মুলা অনুযায়ী এই বৃদ্ধিকে ৬.৯ শতাংশের সমকক্ষ ধরা হয়েছে।

প্রথম ইউপিএ সরকারের ২০০৪-০৯-এর জিডিপি-এর গড় বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৪ শতাংশ। এই বৃদ্ধির হারকে তারিফ করার পাশাপাশি একথাটাও মনে হয় যে ইউপিএ সন্তোষজনক এমন কোন কাজটা করেছিল যাতে জিডিপি-তে এমন বৃদ্ধি ধরে রাখতে পেরেছিল। এই সূত্রে যে কেউই বাজেটের ভাষণগুলি ও সংশ্লিষ্ট যে কোনো কাগজপত্রই ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখতে পারেন। কিন্তু সেখানে বাণিজ্যিক উদারীকরণের যে ধারা আগে থেকেই লাগু ছিল সেটিকে বজায় রাখা আর কেবলমাত্র স্মল স্কেল ইনডাস্ট্রিজের আওতায় থাকা শিল্পের সংখ্যা কিছু কমিয়ে দেওয়া ছাড়া সংস্কারের গতিকে এগিয়ে নিয়ে অর্থনীতির বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার মতো কোনো সিদ্ধান্তই চোখে পড়বে না।

প্রকৃতপক্ষে ওয়াকিবহাল অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা প্রায় একমত যে নরসিমা রাও (১৯৯১-৯৬) যে সংস্কার প্রক্রিয়ার সলতেতে অগ্নিসংযোগ করেছিলেন আর অটলবিহারী বাজপেয়ী (১৯৯৮-২০০৪) তাকে পূর্ণ প্রজ্বলিত করেছিলেন বস্তুত ইউপিএ আমলে তা প্রায় নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রভাবে বাড়তি বৃদ্ধির কারণে যে রাজস্ব সরকারের ঘরে আদায় হচ্ছিল তা দিয়ে ইউপিএ-১ সঠিকভাবেই নানান সামাজিকভাবে হিতকর খরচা বাড়িয়েছিল। কিন্তু অন্যদিকে এই খরচাকে বজায় রাখতে বৃদ্ধির যে উৎসকে সচল রাখা দরকার সেদিকে কোনো নজর তারা দেয়নি। অর্থাৎ উচ্চ জিডিপি বৃদ্ধির ফলে রাজস্ব আদায়ের যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে ধরে রাখার মতো প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

একথা স্বীকার করতে হবে অর্থনীতি বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন কোনো পরিকল্পনা সে অর্থে ইউপিএ-১ নেওয়ার চেষ্টা করেনি। সত্যি কথা বলতে পূর্ববর্তী এনডিএ আমলে নতুন রাস্তা তৈরির যে চুক্তিগুলি ভবিষ্যতের জন্যও বলবৎ থাকবার কথা ছিল সেগুলি সরকার আটকায়নি, ফলে চুক্তিগুলি যথাসময়েই রূপায়িত হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাও ও বাজপেয়ী যে সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন তারই বাস্তবায়নের ফলে ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে এই ধারায় পরিবর্তন ঘটল। সময়কালটা ২০০৯ থেকে ২০১৪। বিরাট সংখ্যক প্রকল্পকে পরিবেশ সংক্রান্ত ত্রুটি বা অন্য নানান বিচ্যুতির অছিলায় ছাড়পত্র দেওয়া আটকে দেওয়া হলো। এতকাল যে সমস্ত পদস্থ আমলাদের কেরিয়ার পঞ্জীতে দুর্নীতির কোনো দাগ ছিল না তাদের অনেকের বিরুদ্ধেই তঞ্চকতার অভিযোগ উঠল, ফলে উচ্চ পর্যায়ের আমলাতন্ত্র একেবারে বসে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াটাই।

এই বসে যাওয়ার বা স্থবিরত্বের জীবাণু যে কত গভীর পর্যন্ত সংক্রামিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে নতুন সরকারের আমলে ২ বছর কেটে গেলেও সরকার এখনও তাঁদের আত্মবিশ্বাস পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করিয়ে দিতে পারেনি।

বুমেরাং হয়ে যাওয়ার মতো কিছু আইন প্রণয়ন— যেমন Retrospective Taxation ও জমি অধিগ্রহণের মতো জটিল আইন— যাতে হয়ত একটি পঞ্চায়েতের বাধাতেই বিশাল কোনো জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আটকে যেতে পারে— এমন বিষয়গুলি বিনিয়োগকারীদের লগ্নীকরার ক্ষেত্রে এক নিদারুণ দোলাচলের পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। ঠিক মতো নজরদারি ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণের অভাবে বহু অযোগ্য ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়, এমন বহু

প্রকল্পে সরকারি ব্যাঙ্কগুলির ঋণ দেওয়ার ফলে সরকারি অর্থ অপচয়ের রাস্তায় যায়। যে কোনো অজুহাতে এই ধরনের ঋণগুলিকে পুনর্গঠনের-এর নামে অর্থনৈতিক বিনাশের পথ ত্বরান্বিত করা হয়। অন্যদিকে, খরচের বাজেট বরাদ্দ রাজস্ব আদায়ে বৃদ্ধি না ঘটা সত্ত্বেও মর্জিমাফিক বাড়িয়ে দেওয়ায় রাজস্ব খাতে ঘাটতি (fiscal Deficit) বিশাল আকার ধারণ করে।

এর পরিণতি হলো ভয়ানক। যে অর্থনীতিকে ইউপিএ-২ এর শাসনকালের প্রথম তিন বছরে গড় ৮.১ শতাংশ বৃদ্ধির নিরিখে অপ্রতিরোধ্য মনে হয়েছিল সেই অর্থব্যবস্থাই বস্তুত এক ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়াল। An Economist Story (24.8.2013)-র পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এক হাড়হিম করা অর্থনৈতিক ব্যাধির চিত্র ফুটে উঠেছে। (১) বৃদ্ধির হার ৪ থেকে ৫ শতাংশে নেমেছে। (২) মুদ্রাস্ফীতি ১০ শতাংশ ছুঁয়েছে। (৩) চলতি খাতে (current Account) ঘাটতি ৪ থেকে ৫ শতাংশ আর টাকার দরেও ইউপিএ-২-এর শেষ তিন মাসে ১৩ শতাংশ অবমূল্যায়ন ঘটে। ওই পত্রিকাটির বিশ্লেষণ অনুযায়ী ওই সময় দেশের অর্থনীতি ১৯৯১ সালের সমতুল্য বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল।

এখন যে সমস্ত অর্থনৈতিক ভাষ্যকার এটা প্রচার করার চেষ্টা করছেন যে বাস্তবে হেরফের কিছুই হয়নি, ২০১৪ সালে ইউপিএ-২ যেখানে ছেড়ে গিয়েছিল আজও দেশ সেখানেই দাঁড়িয়ে। কথাটা বাস্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বর্তমান সরকারের আমলে ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচকের মুদ্রাস্ফীতি ৫ শতাংশ নেমে এসেছে। পাইকারি মুল্যসূচক বৃদ্ধি নেই আর চলতি খাতে ঘাটতি (আমদানি রপ্তানি খাতে) ১ থেকে ২ শতাংশের আশেপাশে। সারা বিশ্বের অর্থনীতি যেখানে সঙ্কটের অবস্থা থেকে বেরোবার চেষ্টা করছে সেই অবস্থায় ভারতের বৃদ্ধি ২০১৩-১৪ সালের নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী ৬.৯ শতাংশ থেকে ২০১৪-১৫ সালে ৭.২ শতাংশ ও ২০১৫-১৬ (আগাম হিসেব অনুযায়ী) ৭.৬ শতাংশে পৌঁছতে চলেছে। ২০১৫-১৬ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকের আগাম হিসেবে ৭.৮ শতাংশ পৌঁছবার কথা শোনা যাচ্ছে। এটি সেই যাদু সংখ্যা ৮ শতাংশের ঠিক কান বরাবর নয় কি?

অন্যদিকে, ২০১৩ সালে এফডিআই (Foreign Dircet Investment) যা

"এখন যে সমস্ত অর্থনৈতিক ভাষ্যকার এটা প্রচার করার চেষ্টা করছেন যে বাস্তবে হেরফের কিছুই হয়নি, ২০১৪ সালে ইউপিএ-২ যেখানে ছেড়ে গিয়েছিল আজও দেশ সেখানেই দাঁড়িয়ে। কথাটা বাস্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বর্তমান সরকারের আমলে ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচকের মুদ্রাস্ফীতি ৫ শতাংশ নেমে এসেছে। পাইকারি মুল্যসূচক বৃদ্ধি নেই আর চলতি খাতে ঘাটতি (আমদানি রপ্তানি খাতে) ১ থেকে ২ শতাংশের আশেপাশে।"

ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারা আবার বর্ধিত শক্তি নিয়ে ফিরতে চলেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৩-১৪ সালের থেকে ২০১৪-১৫ সালে ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ সালের হিসেব ২০১৪ সালের সেই একই সময়ের (এপ্রিল-ডিসেম্বর ২০১৪) তুলনায় এক লাফে ৪০ শতাংশ বেড়েছে।

যদি অর্থনীতির কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্র সাপেক্ষে (sector specific) দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় তখন এটা বুঝতে হবে সেই বিশেষ ক্ষেত্রটি উত্তরাধিকার সূত্রেই সমস্যাকীর্ণ ছিল। আর এই নির্দিষ্ট কোনো কোনো ক্ষেত্র ধরে উন্নয়নে সমগ্র অর্থনীতির উন্নয়নের তুলনার সময় একটু বেশি লাগে।

একথা স্মরণ করা দরকার, রাও সরকারের সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রথম দু' বছরের মধ্যেই আন্তর্জাতিক বিনিময় হার, মুদ্রাস্ফীতি ও চলতি খাতে ঘাটতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ৯১ সালের সঙ্কট সময়ের আগের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার পুনরুদ্ধার হয়েছিল। কিন্তু বৃদ্ধির নজরকাড়া গতি এসেছিল ২০০৩-০৪ অর্থবর্ষে। কেননা রাও ও বাজপেয়ী সংস্কারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধাঁচায় ঠিক ঠাক মাপে যেতে এই সময়টা লেগেছিল। অথচ ২০০০-এর গোড়ায় বহু অর্থনীতি বিশেষজ্ঞকে বলতে শোনা গিয়েছিল যে, যতই সংস্কারের কথা বলা হোক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তার (সংস্কারের) সেরকম উল্লেখযোগ্য প্রভাব মোটেই ফেলতে পারেনি। এই কথাটা মাথায় রাখলেই বলা যায় সামনের দিনে কী হতে চলেছে। ২০১৪ সাল থেকে নীতির ক্ষেত্রে বহু বুনিয়াদি পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, তাই বুক ঠুকে বলা যায়— ২০০৩-০৪ সাল থেকে ২০১১-১২ অবধি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ৮.৩ শতাংশের যে যাদু সংখ্যা (Miracle figure) ধরা দিয়েছিল, আবার তা দেশের করায়ত্ত হতে চলেছে।

(লেখক নীতি-আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান)

কমিউনিস্ট, মাওবাদী, নকশালিদের হাতে আক্রান্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কিশোর বর্মন

জে এন ইউ-র পর আবার খবরের শিরোনামে যাদবপুর। আবার গণতন্ত্র, বাক্-স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, অসহিষ্ণুতা আর গরিব মেহনতি মানুষের মুখোশের আড়ালে রাজনীতি করা দেশদ্রোহী কমিউনিস্টদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের লড়াই। আবারও সক্রিয় সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষকমহল, বিশিষ্ট মহল, দু-একটি অতিবাম মিডিয়া-সহ কিছু মুষ্টিমেয় তথাকথিত বুদ্ধিজীবী। মেকি-সেকু-মাকুরা আবারও বিসর্জন করছেন কুম্ভীরাশ্রু। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ মে-র মূল ঘটনা এড়িয়ে এমনভাবে সবকিছু উপস্থাপন করার চেষ্টা করছেন, যেন ওই দিন তাঁরা কোনো কিছুই করেননি। কোনো অন্যায় তাঁরা করেননি। সবাই যেন দুধে ধোয়া নির্মল চরিত্রের--- ধোয়া তুলসীপাতা। তাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্য ঘটনা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

স্ব-ঘোষিত মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়া বারবার দেখানোর চেষ্টা করছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আর এস এস, বিজেপির রোষানলে পড়েছে। বিজেপি বনাম যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীদের লড়াই। কিংবা যাদবপুরের ছাত্রছাত্রী ও বহিরাগতের লড়াই। অথবা সেখানে এবিভিপি-র কোনো অস্তিত্ব নেই। এবিভিপি-র বিরোধিতা করা মানেই কি দেশের বিরোধিতা? ক্যাম্পাসে বহিরাগতরা কেন ঢুকবে ইত্যাদি।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন, এ লড়াই আর এস এস, বিজেপি কিংবা এবিভিপি-র নয়। এ লড়াই দেশদ্রোহী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয়তাবাদী ছাত্রছাত্রীদের। এ তাদের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। কমিউনিস্টদের রক্তাক্ত ইতিহাস আজ জনসম্মুখে উন্মোচিত। গত চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনে শুধু এ রাজ্যেই ৫৫ হাজার ৪০৮ জন মানুষকে খুন করেছে এই বামপন্থীরা। সারা পৃথিবীতে তারা ১৭ কোটি লোককে হত্যা করেছে। এটা তার প্রতিবাদ। এটা বামপন্থীদের বিরুদ্ধে সেই গণরোষ। এবিভিপি তার সমর্থক মাত্র।

এটাই এবিভিপি-র প্রথম প্রোগ্রাম নয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর আগেও হয়েছে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই হয়েছে। বহিরাগত হলে কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিতেন না। এমন করে বলা হচ্ছে যেন এই প্রথম কোনো বহিরাগত ক্যাম্পাসে ঢুকলো। মনে হচ্ছে, কোনো দিন কোনো আমলে কোনো ক্যাম্পাসে কোনো বহিরাগত ঢোকেনি। ডি রাজা, সীতারাম ইয়েচুরি, রাহুল গান্ধী, আনন্দ শর্মারা যেন ছাত্র, শিক্ষক কিংবা শিক্ষাকর্মী! বহিরাগতরা ক্যাম্পাসে ঢুকুক কোনো অবস্থাতেই আমরা তা সমর্থন করি না। নিয়ম হলে সবাইকে এক নিয়মের আওতায় ফেলা উচিত। নিয়ম হোক— ক্যাম্পাসে কোনো বহিরাগত ঢুকবে না। দেখি কার বুকে কত দম আছে। আছে কার কতো হিম্মত।

যাদবপুরে আক্রান্ত অধ্যাপক দেবাশিস চৌধুরী।

৪০০-রও বেশি ছাত্রছাত্রী সেদিনের এবিভিপি-র অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে। তারাও কী বহিরাগত? যে ৪ জনকে হেনস্থা করা হয়েছে তাঁরা আমন্ত্রিত অতিথি। তাঁর মধ্যে দেবাশিস চৌধুরী একজন অধ্যাপক, যাঁকে সবচেয়ে বেশি হেনস্থা করা হয়েছে। আসল কথা, এবিভিপি-র জনপ্রিয়তায় বামবাবুরা শঙ্কিত। সুতরাং যেন তেন প্রকারেণ এদের আটকাও। আর না পারলে বদনাম করো, গালাগাল দাও।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন নয়। আমরা চাই না বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কালিমালিপ্ত হোক। আমাদের লড়াই মুষ্টিমেয় কিছু দিকভ্রষ্ট ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক বা অশিক্ষক কর্মচারীর বিরুদ্ধে যারা বছরের পর বছর মাওবাদ, নকশালবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদি অন্তরালে দেশদ্রোহিতার বিষ কিছু ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। তাতে বদনাম হচ্ছে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা। তাঁরা কালিমালিপ্ত করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম।

এখন জাতীয়তাবাদী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যাদবপুরে ক্রমাগত বাড়ছে। তাই গেল গেল রব। আমরা অভিনন্দন জানাই সেই ছাত্রছাত্রীদের। আমরা চাই আবার জাতীয়তাবাদের কেন্দ্র হয়ে উঠুক এই বিশ্ববিদ্যালয়। হাজার হাজার দেশপ্রেমিক যুবক যুবতী বেরুক এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। যারা আগামী দিনে এই দেশকে নেতৃত্ব দেবে নানা দিক থেকে। যে স্বপ্ন নিয়ে ঋষি অরবিন্দ এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবার তার বাস্তবায়ন হোক। মাওবাদ, নকশালবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদের সাপ্লাই সেন্টার নয়; আই এ এস, আই সি এস এবং প্রকৃত ইন্টেলেকচুয়াল সাপ্লাই সেন্টারে পরিণত হোক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। যার জন্য দেশে তার পরিচিতি ছিল।

কিছু মুষ্টিমেয় ছাত্রছাত্রীর জন্য নষ্ট হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসকে তারা গড়ে তুলতে চাইছে দেশবিরোধী শক্তির সাপ্লাই সেন্টারে। নানান অসামাজিক কাজ, নেশাদ্রব্যের ব্যবহার, দেশবিরোধী স্লোগান (কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, মণিপুর মাঙ্গে আজাদি, কেরল মাঙ্গে আজাদি ইত্যাদি), স্বামী বিবেকানন্দকে অপমান করা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ছবিতে কালি ছিটিয়ে অপমান করা, প্রকাশ্যে চুম্বন ইত্যাদি বছরের পর বছর ধরে চলছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে দিনের আলোয় অথবা রাতের অন্ধকারে। এছাড়াও মাঝে মাঝেই কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা প্রফেসর গিলানির মতো ব্যক্তিত্বদের ও মণিপুরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের নিয়ে এসে দেশবিরোধী সেমিনার তথা বিভিন্ন আলোচনা চক্র আয়োজিত হয়ে থাকে এই ক্যাম্পাসে। বহু ছাত্রছাত্রী এর আগেও এই সমস্ত কার্যক্রমের বিরোধিতা করেছেন। আজও করছেন।

মাঝেমধ্যেই এই সমস্ত গোলমালের জেরে একবার কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সি সি টিভি ক্যামেরার আওতায় আনার। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এই র‌্যাডিক্যাল ছাত্রদের দল। কারণ ক্যাম্পাসে সিসি টিভি ক্যামেরা বসলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সিক্রেসি থাকবে না। নষ্ট হয়ে যাবে। অবশেষে কর্তৃপক্ষকে পিছু হটতে বাধ্য করা হয়। আমরা জানতে চাই কিসের সিক্রেসি?

এই সমস্ত কিছুর জন্যে দায়ী এবং তার হর্তা-কর্তা-বিধাতা হলেন ‘র‌্যাডিক্যাল’ নামে পরিচিত মাওবাদী, নকশালিস্ট এবং দেশদ্রোহী কমিউনিস্ট ছাত্র সংগঠনগুলি। তাদের কাজের বিরোধিতা করায় সত্তরের দশকে এরাই হত্যা করেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য গোপাল চন্দ্র সেন-কে। কর্তব্যরত অবস্থায় ক্যাম্পাসের মধ্যেই তাঁকে খুন করে ওই হার্মাদরা। আজ যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী ছাত্রছাত্রী তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের অভিনন্দন জানাই। যাদবপুরের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীর পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত দেশভক্ত ছাত্রছাত্রী তথা শিক্ষানুরাগী এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানাই।

> **“এ আন্দোলন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নয়। এ লড়াই মুষ্টিমেয় কিছু দিক্‌ভ্রষ্ট ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক বা অশিক্ষক কর্মচারীর বিরুদ্ধে যারা বছরের পর বছর মাওবাদ, নকশালবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদির অন্তরালে দেশদ্রোহিতার বিষ কিছু ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ছড়ানোর চেষ্টা করছেন।”**

দেখে নেওয়া যাক কী ঘটেছিল সেদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে :

বিবেক অগ্নিহোত্রীর নতুন দেশাত্মবোধক ছবি ‘বুদ্ধ ইন অ্যা ট্রাফিক জ্যাম’ প্রদর্শনের অনুমতি চেয়ে গত ৩ মে এবিভিপি-র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সংগঠন থিঙ্ক ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয়। কর্তৃপক্ষ অনুমতি গৃহীত হয়েছে বলে প্রয়োজনীয় অর্থও গ্রহণ করে ৪ মে। অনুষ্ঠান ৬ মে বিকাল ৪টে। তার আগের দিন ৫ মে হঠাৎ সন্ধ্যা ৫.৪৫ মিনিটে থিঙ্ক ইন্ডিয়া-র আহ্বায়কের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ফোন আসে যে তাদের অনুমতি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কারণ দেখানো হয় ইলেকসান কোড অফ কনডাক্ট। আমাদের আহ্বায়ক প্রশ্ন করেন যদি তাই হয় তবে অনুমতি দেওয়া হলো কেন? কোনো উত্তর আসেনি তখন। অনুমতি বাতিল হওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই ছাত্রছাত্রীরা সিদ্ধান্ত নেয় ফাঁকা মাঠে সিনেমা দেখানো হবে। কর্তৃপক্ষ মাঠে সিনেমা দেখানোর অনুমতি ফোনেই প্রদান করেন। বলাবাহুল্য যেখানে এর পূর্বে র‌্যাডিক্যাল বিনা অনুমতিতে বহু আপত্তিকর সিনেমা দেখিয়েছিল।

৬ মে বিকাল ৪টেয় শুরু হলো প্রস্তুতি। বাক্‌স্বাধীনতার সমর্থকরা নেমে পড়ল এবিভিপি-র বাক্‌ রুদ্ধ করার জন্যে। যেন তেন প্রকারেণ এবিভিপি-র প্রোগ্রাম বানচাল করতে হবে, তাই কাপুরুষের দল শুরু থেকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করল অতীতের ব্রা-প্যান্টি-ন্যপকিন- প্রকাশ্যে জড়াজড়ি করে চুমু খাওয়া আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক মুক্ত ও অবাধ যৌনতার সমর্থক মেয়েদের।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পূর্বেই বিবেক অগ্নিহোত্রীর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে গণতন্ত্রের নামাবলী ধারণকারী র‌্যাডিক্যাল গ্রুপ। তাঁর গাড়িতে লাঠির আঘাত করা, লাথি মারা, থুথু দেওয়া। স্লোগান তোলে বিবেক অগ্নিহোত্রী

গো-ব্যাক, বিবেক অগ্নিহোত্রী মুর্দাবাদ, এবিভিপি গো-ব্যাক, এবিভিপি মুর্দাবাদ, কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, মণিপুর মাঙ্গে আজাদি, কেরল মাঙ্গে আজাদি, সঙ্গে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ। এই হলো কমরেডদের সহিষ্ণুতার নমুনা। তা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের তৎপরতায় ছবির প্রদর্শন শুরু হয়।

সিনেমা প্রদর্শনে ৪০০-র বেশি ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক সমর্থন দেখে ভীতুরা দূর থেকেই চালাতে থাকে গালিগালাজ আর দেশবিরোধী স্লোগান। এবিভিপি-র দিকে ছাত্রছাত্রীরা দিতে থাকে ভারতমাতার জয়ধ্বনি। পরিস্থিতি উত্তপ্ত। ধৈর্যের পরিচয় দেন এবিভিপি-র কার্যকর্তারা। তাদের প্ররোচনায় পা দেননি ছাত্রছাত্রীরা।

শেষ হলো সিনেমা। শুরু হলো বিবেক অগ্নিহোত্রীর ভাষণ। তিনি তাঁর ভাষণে র‍্যাডিক্যালের প্রতিনিধিদের আহ্বান করেন বিরোধিতা না করে সিনেমা দেখে কিছু আপত্তি থাকলে তাঁকে জানাতে। দেশদ্রোহীরা সিনেমাটির কোনো বিরোধিতা করতে পারছিল না। তাই চেষ্টা শুরু হলো প্রোগ্রাম বানচাল করার অন্য প্রক্রিয়া। প্রথমত, ধাক্কাধাক্কি করে মারপিট করার পরিকল্পনা। তা ব্যর্থ হলো। দ্বিতীয়ত, অসভ্য মেয়েদের লেলিয়ে দিয়ে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে হাঙ্গামার সৃষ্টি করা। তাতেও বিফল হয়ে সরাসরি পেছন থেকে আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণে গুরুতর আহত হন প্রফেসর দেবাশিস চৌধুরী, প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, সন্দীপ দাশ-সহ ৪ জন। ৪ জনকে আটকে রেখে ৪ ঘণ্টা ধরে মিডিয়ার সামনে করা হয় শারীরিক ও মানসিক ভাবে হেনস্থা। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়ে সবাইকে। এঁরা অতিথি রূপে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আরোও মারাত্মক ঘটনা হলো কিছুদিন পূর্বে যারা নিজেদের দলিতদের মসিহা হিসেবে তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা মিডিয়ার মাধ্যমে চালিয়েছিলেন সেই দেশদ্রোহী বামপন্থীদের আট-দশ জন ছেলে সন্দীপ দাশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওদের মধ্যে একজন তাঁর নাম জিজ্ঞেস করে। সন্দীপ দাশ বলার পর, 'দাশ' শুনেই জিজ্ঞেস করে তোর জাত কী? সন্দীপ জাতিতে মুচি বলার সঙ্গে সঙ্গেই তারা বলে উঠে--- তুই মুচি, ছোটলোকের বাচ্চা, এতবড় ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছিস্ কোন সাহসে? বলে প্রান্তিক কৃষক পরিবারের দলিত ছাত্র সন্দীপকে মাটিতে ফেলে পেটে, বুকে, মুখে বুটপরা পায়ে দামাদম লাথি মারতে থাকে। অপর দিকে মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে যায় প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। তাদের ছাড়ার দাবিতে চলতে থাকে ধরনা, বিক্ষোভ। করা হয় যাদবপুর থানা ঘেরাও। ওদিকে র‍্যাডিক্যালের মেয়েরা এবিভিপি-র ছেলেদের উত্তেজিত করে তোলার চেষ্টা করছে নানারকম অঙ্গ ভঙ্গিমায় অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিয়ে, যা এই লেখায় উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

অবশেষে এবিভিপি-র আন্দোলনের চাপে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই চারজনকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাদের নামে দায়ের করা হয় শ্লীলতাহানির মিথ্যা মামলা। থানার সামনে চলতে থাকে ক্ষোভ বিক্ষোভ রাত ৩টে পর্যন্ত।

সমস্ত প্রক্রিয়া এবং ঘটনা ঘটেছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সামনে। মারধোর, হেনস্থা, প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া থেকে ছাড়া পর্যন্ত সমস্তটা মিডিয়ার ক্যামেরাবন্দি হয়েছে। ছবিগুলি দেখলেই বোঝা যায় কে কাকে হেনস্থা করছে কিংবা শ্লীলতাহানি

বিবেক অগ্নিহোত্রীর গাড়ি ঘিরে অভব্য আচরণ বাম-ছাত্রছাত্রীদের।

করছে। মজার ব্যাপার হলো, ১০ জন মেয়ে অভিযোগ করেছেন অভিযুক্ত ৪ জন তাদের শ্লীলতাহানি করেছেন। এ বড়ই হাস্যকর! অবান্তর!

দু-একটা ইলেকট্রনিক মিডিয়া সত্য ঘটনা ধামাচাপা দিতে মূল ঘটনাটি আড়াল করে শুধুমাত্র শ্লীলতাহানির মিথ্যা অভিযোগকে বড় করে দেখানোর চেষ্টা করছে। যদিও কোনো ভিডিও ফুটেজে শ্লীলতাহানির মতো দৃশ্য তারা দেখাতে পারেনি। এই মিডিয়াগুলো লোককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। দেশদ্রোহীদের হয়ে দালালি করছে। আমরা ঘটনার তদন্ত চাইছি। তা হলেই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে সেদিন কী ঘটেছে। কিন্তু তদন্তের কথা শুনেই তাদের নাভিশ্বাস উঠছে। সত্য ঘটনা মানুষের সামনে তুলে ধরা হলে তাদের মুখোশ খুলে যাবে। তাই র‍্যাডিক্যালদের খুবই ভয়।

যে ধরনের দেশদ্রোহী কার্যকলাপ দিনের পর দিন যাদবপুর ক্যাম্পাসে চলছে তা নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা, ক্যাম্পাসকে দেশদ্রোহীদের হাত থেকে রক্ষা করা আমার আপনার এবং প্রত্যেকটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কর্তব্য। আসুন আমরা সবাই মিলে এই কর্তব্য পালন করি।

(লেখক এবিভিপি-র রাষ্ট্রীয় সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক)

যাদবপুর কাণ্ড : উপাচার্য ও সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ৬ মে রাত্রে যাদবপুর কাণ্ডের পর অভিধানে শ্লীলতাহানির সংজ্ঞা পাল্টেছে বলে গোটা পুলিশমহলে রীতিমত রসিকতা চালু হয়েছে। রাজ্যের সাধারণ মানুষ থেকে পুলিশ, যতগুলি ভিডিয়ো ফুটেজ এখনও অবধি পৌঁছেছে তাতে দেখা যাচ্ছে বঙ্গবাসী কলেজের এক কৃতী অধ্যাপককে বেধড়ক মার সহ নিদারুণ হেনস্থা করছে একদল ছাত্রী।

উপাচার্য সুরঞ্জন দাস

বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে বরং এই ছাত্রীদেরই অশালীন আচরণের ছবি ফুটে উঠেছে। অথচ এরাই শ্লীলতাহানির যে অভিযোগ করেছিল তার স্বপক্ষে ন্যূনতম প্রমাণও জোগাড় করতে পারেনি। ঘটনার দিন রাত্রে উপাচার্য সুরঞ্জন দাস যাদবপুরের কিছু ছাত্রীর হাতে আক্রান্ত বঙ্গবাসীর অধ্যাপক সহ চারজনের নামে এফ আই আর দায়ের করায় স্বাভাবিকভাবেই পুলিশমহলে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। বিস্ময় আরও বাড়ে পরের দিন— এফ আই আর-এর কী হলো তা জানতে চেয়ে উপাচার্য চাপ তৈরি করায়।

পুলিশের একাংশ ঘনিষ্ঠমহলে স্বীকার করেছে, নির্বাচন কমিশনের দৌলতে তারা নিজেদের মেরুদণ্ডী প্রমাণ করার যে সুযোগ পেয়েছে, যাদবপুরের ঘটনায় তা কোনোভাবেই হারাতে চায় না। আক্রান্তরাও এফ আই আর করেছে এবং সংবাদমাধ্যমের ফুটেজ সহ অন্যান্য পারিপার্শ্বিক প্রমাণ তাদের স্বপক্ষেই যাচ্ছে। তাহলে প্রশ্ন, সব জেনেবুঝে উপাচার্য এই মিথ্যা এফ আই আর-এর দায় মাথায় নিতে গেলেন কেন? শুধুই কি যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীদের 'পিতৃত্বে'র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার বাসনায়? বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, উপাচার্যের এই উস্কানির পেছনে একটি সংবাদ-সংস্থার বড়ো ভূমিকা রয়েছে। তাদের প্রভাবিত দৈনিকের এক প্রতিনিধিই এই ঘটনার ক্ষেত্রে পরোক্ষে দায়ী। 'বুদ্ধ ইন আ ট্রাফিক জ্যাম' চলাকালীনই সেই প্রতিনিধি নিজেকে 'আক্রান্ত' দাবি করে পরিস্থিতি ঘোরাল করে তোলে।

সেই সংবাদ-সংস্থারই বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ভূমিকা আরও নক্কারজনক। ঘটনার রাত্রে আক্রান্তদের যখন যাদবপুরের একটি ঘরে আটকে রেখে শাসানো হচ্ছে তখন তাদেরই 'আক্রান্তকারী' হিসেবে খবর-পরিবেশনের কৃতিত্ব ওই সংবাদ-চ্যানেলটিরই। এদের পেটোয়া কিছু 'বুদ্ধিজীবী' ততক্ষণে স্টুডিয়ো আলো করে যাদবপুরের নকশালদের গুণ্ডাগিরিকে সমর্থন করতে নানা অপযুক্তি সাজাচ্ছে। সেদিন অবশ্য এদের সব পেটোয়া 'বুদ্ধিজীবী' হাজির ছিলেন না। কিন্তু সাধারণত যাঁরা থাকেন তাঁদের বিরুদ্ধেই রয়েছে অভিযোগের পাহাড়। যেমন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুই অধ্যাপক, ছাত্রজীবনে যাঁরা এস এফ আই তো করেছেনই, এমনকী সিমির এজেন্ট হিসেবেও সক্রিয় ছিলেন বলে অভিযোগ। আছেন দুই শিক্ষাবিদ, একজন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, অন্যজন একটি কলেজের (অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রাক্তন অধ্যক্ষ। আছেন এক চিত্রশিল্পী, যিনি ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল, ১৪-র লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস, এখন বোধহয় সিপিএমের দিকে ঝুঁকেছেন। এদেরই 'বিশেষজ্ঞ' সাজিয়ে স্টুডিয়োতে বসিয়ে নানা অপকর্মকে সিলমোহর দেওয়ার চেষ্টা করে চ্যানেলটি। তাদেরই শিক্ষা বিষয়ক সংবাদ কভার করার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি প্রথমে উপাচার্যের ঘাড়ে ঘটনার দোষ চাপানোর চেষ্টা করে। তাতে সুবিধে হবে না বুঝে (কারণ উপাচার্য যুক্তিসঙ্গত ভাবে সে দায় প্রাক্তনী সংসদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন) উপাচার্যকে এফ আই আর নিয়ে চাপ দিতে থাকে— চ্যানেলে বে-আব্রুভাবে সেটি দেখা যায়। কিন্তু উপাচার্য সেই ফাঁদে পা দেবেন কেন? প্রশ্ন উঠছেই।

অন্য রকম

এক কন্যার বর্ণময় উত্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এ বছর আই এ এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন দিল্লীর টিনা দাবি। দলিত পরিবারের মেয়ে টিনার এই সাফল্যে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে দিল্লী উত্তরপশ্চিম কেন্দ্রের সাংসদ এবং দলিত নেতা উদিত রাজ টুইটারে লিখেছেন, 'নেপোলিয়ান বলেছিলেন সুযোগ না পেলে প্রতিভার বিকাশ হয় না। একটা দলিত মেয়ে আই এ এস পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে, এ কথা পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ভাবাও যেত না।' দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও টিনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন।

এদিকে টিনার একটি সিদ্ধান্ত সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি হরিয়ানা ক্যাডারে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক সফল আই এ এস পরীক্ষার্থীকে কাজ শুরু করার ক্ষেত্র হিসেবে একটি রাজ্য বেছে নিতে হয়। টিনার পছন্দের রাজ্য হরিয়ানা। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য, 'আমি হরিয়ানাকে বেছে নিয়েছি, কারণ এখানে কাজ করার স্কোপ আছে। অর্থনীতির দিক থেকে দেখলে এ রাজ্য অনেক এগিয়ে আবার সামাজিক ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই পিছিয়ে।' সামাজিক ক্ষেত্রে হরিয়ানার পিছিয়ে পড়ার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন টিনা। তাঁর মতে, 'কারণটা হলো হরিয়ানার মানুষের পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা আর লিঙ্গবৈষম্য। দুটোই আমার হৃদয়ের খুব কাছের। আমি নিজে মেয়ে। জন্মেছি খুবই উদার একটি পরিবারে। পড়াশোনাও করেছি এমন একটি কলেজে যেখানে এই ধরনের সমস্যাকে খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়।'

টিনার জন্ম ভূপালে। বাবা যশওয়ন্ত দাবি টেলিকম বিভাগের কর্মী। মা হিমালি দাবি ইঞ্জিনিয়ার। বাড়ির চতুর্থ সদস্য টিনার বোন রিয়া। টিনা ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় দাবি-পরিবার ভূপাল থেকে দিল্লী চলে আসে। টিনা পড়াশোনা করেছেন জেসাস অ্যান্ড মেরি কনভেন্টে। নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান নেন। এই সময় থেকেই তিনি আই এ এস পরীক্ষায় বসার কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে শুরু করেন। টিনা দিল্লীর লেডি শ্রীরাম কলেজের স্নাতক। বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান। স্নাতকোত্তর পড়াশোনা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর একটানা এক বছর আই এ এস পরীক্ষায় বসার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ। যার ফল ওই গগনচুম্বী সাফল্য!

কেমন ছিল প্রস্তুতির সেই দিনগুলো। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট শিডিউল বানিয়ে রোজ নিয়ম করে আট থেকে দশ ঘণ্টা পড়াশোনা। ছোট ছোট লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে সেই মতো অনুশীলন এবং অবশ্যই কঠোর শৃঙ্খলা। টিনা বললেন, 'ওগুলো খুব বড়ো ব্যাপার নয়। এই পরীক্ষার আসল চ্যালেঞ্জ হলো একাকিত্ব আর একঘেয়েমি। পড়াশোনার বাইরেও যে একটা জীবন আছে সেটা সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হয়।'

টিনার আক্ষেপ স্বাভাবিক। কারণ তিনি মধুবনী আর্টের শিক্ষিত শিল্পী। সর্বভুক পড়ুয়া এবং হলিউড তারকা জেন অস্টিনের পাগল ভক্ত। কিন্তু দিনের শেষে তিনি নিখাদ ভারতীয়। সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্ব বাবা-মাকে দিয়ে বললেন, 'ওরা সাহায্য না করলে আমি এই জায়গায় পৌঁছতে পারতাম না। মা-ই আমার আদর্শ।' মা হিমালি দেবী জানালেন, 'আমরা জানতাম ও পারবে। কিন্তু ফার্স্ট হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। ও ওর লক্ষ্য ছুঁতে পেরেছে তাতেই আমি খুশি।' পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য রিয়া। দিদিকে নিজের প্রেরণা হিসেবে বর্ণনা করে বললেন, 'ওর রেজাল্ট দেখে আমি একটু চাপে পড়ে গেছি। আমিও ওরই মতো হতে চাই তো, তাই। ও আমাদের গর্ব। আমার হিরো।'

টিনা সত্যিই আজ শুধু নায়িকা নন, নায়কও। কেবল দলিতরা নন সারাদেশে আজ তার প্রশংসা। পরীক্ষায় প্রথম পরে অনেকেই হবেন কিন্তু আবাল্য যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তারই সমাধানে নিজেকে উৎসর্গ করার সাহস সবাই দেখাতে পারবেন না। টিনাকে শুধু এই কারণেই অনেকদিন মনে রাখতে হবে।

মা-বাবার সঙ্গে টিনা (মাঝখানে)।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) : ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন : ২৪১৫-৩৫৬৬

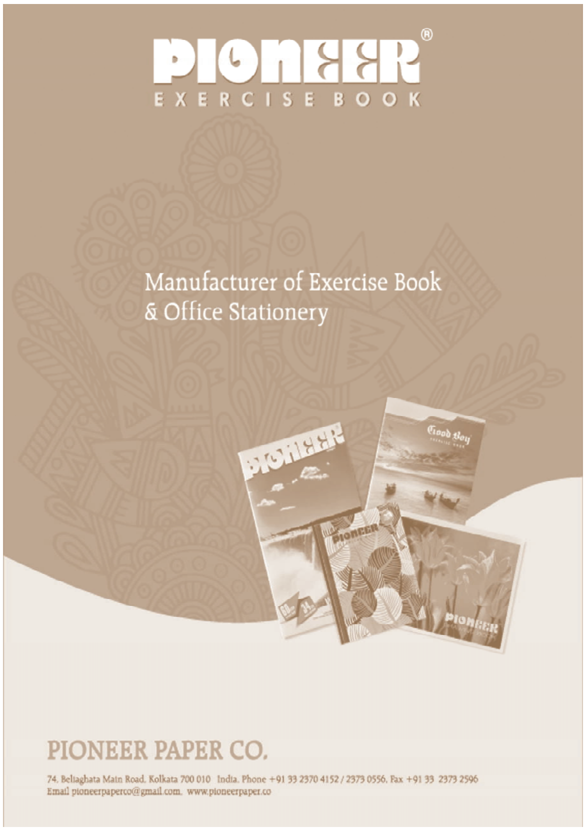

'শিল্প বিজ্ঞান নয়। যা কিছু চিরসুন্দর— ইন্দ্রিয়সুখমণ্ডিত সৌন্দর্য তা নাও হতে পারে, তাকেই প্রকাশ করা শিল্পের প্রকৃত কাজ। যা কিছু অপ্রয়োজনীয়, যা কিছু নিজ রুচিতে অসুন্দর, তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার শিল্পের আছে। তিনি তাঁর শিল্পকর্ম নিজভাবেই সম্পন্ন করবেন, স্বাভাবিকভাবে আমরা তা অনুমান করতে পারি এবং এও বিশ্বাস করি, শিল্পীর রুচি ও বিচার অনুযায়ী তাঁর শিল্পকর্মটির প্রশংসা বা নিন্দা (সমালোচনা) আমরা করতে পারি।'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

সুস্থ শরীরে বাঁচতে হলে

সরোজ কুমার ভড়

সুস্থ শরীরে বেশিদিন বাঁচার জন্য যোগ-প্রাণায়াম কীভাবে সাহায্য করতে পারে সেই সম্পর্কে জানার আগে যোগ এবং তার অঙ্গ প্রাণায়াম কাকে বলে তা একটু জেনে নেওয়া দরকার।

গভীরভাবে যোগ-প্রাণায়ামের ব্যাখ্যায় না গিয়ে সাধারণভাবে বলা যায় 'সংযমপূর্বক সাধনার দ্বারা নিজের অন্তর্নিহিত সত্তার বিকাশ ঘটিয়ে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনে সমাধির আনন্দ উপভোগ করাই হলো যোগ'। মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্র অনুযায়ী যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারনা, ধ্যান এবং সমাধি— এই হলো যোগের আটটি অঙ্গ।

প্রাণায়াম হলো 'প্রাণের আয়াম'। সাধারণ অর্থে প্রাণকে আমাদের শরীরে বেশিদিন ধরে রাখার যে পদ্ধতি তাকেই বলা হয় প্রাণায়াম। প্রাণ যদি শরীর থেকে বের হয়ে যায় তাহলে এই শরীরের কোনো মূল্যই থাকে না। শরীরটাকে যদি আমরা মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করি আর প্রাণ বা আত্মাকে মন্দিরের দেবতার সঙ্গে, তাহলে বিষয়টি অতি সহজেই মনে ধরবে। যে মন্দিরে পূজারি যান না, পূজা-অর্চনা হয় না, শাঁখ-কাঁসর-ঘণ্টা বাজে না, মালা-ফুল-চন্দন ইত্যাদির প্রয়োগ হয় না, কুকুর-বিড়াল-সাপ-খোপ বাসা বাঁধে— সেই মন্দিরে দেবতা আছে বলে কেউ মনে করে না। সেই মন্দির অপবিত্র মন্দিরে পরিণত হয়। তেমনি যে শরীরে গ্যাস, অম্বল, আমাশা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ইউরিক অ্যাসিড, আর্থারাইটিস, থাইরয়েড, ব্লাডসুগার, চর্মরোগ, স্থূলত্ব, সাইনাস্, মাইগ্রেন, অ্যাপিলেপ্সি, পিরিয়ডের গোলমাল, হরমোনের গোলমাল, সাদাস্রাব, টনসিলাইটিস্, ব্রঙ্কাইটিস, অ্যাজমা, ক্যানসার ইত্যাদি রোগের বাসা তৈরি হয়েছে, সেই শরীর অপবিত্র, পোড়ো মন্দিরের মতোই। সেখানে প্রাণ আত্মারূপ দেবতাকে ঈশ্বর বেশিদিন রাখতে চাইবেন না। তিনি সেই শরীর থেকে প্রাণ আত্মাকে সরিয়ে নিয়ে অন্য নতুন শরীরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সদা সচেষ্ট হন। তাই এই মন্দিররূপ শরীর, যা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, তা পবিত্র রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। এই পবিত্র মন্দিররূপ শরীরকে স্বজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে আমরাই অপবিত্র করেছি। আমরা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষই যে-কোনো কর্ম নিয়ে অবিরাম ছুটছি। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছি এই ছুটোছুটির প্রকৃত উদ্দেশ্যটা কী? তবে উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন— সুস্থ শরীরে বেশিদিন বাঁচলে তবেই সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। তাই শরীরে যা হয়েছে তা নিয়ে আর বেশি চিন্তা নয়, আজ থেকে, এখন থেকে যদি আমরা যোগ-প্রাণায়ামের প্রতি যত্নবান হই, আসন, যম, নিয়ম, প্রত্যাহার, ধারনা, ধ্যান ও সমাধির প্রতি যত্নবান হই, তাহলে শরীরের চক্র বা সিস্টেম্‌গুলি ঠিক হয়ে যাবে, আমরা আবার নবজীবন লাভ করতে পারবো।

আমরা প্রত্যেকেই হয়তো কম বেশি প্রাণায়াম ও আসন করে থাকি। কিন্তু কোন কোন রোগের জন্য কোন কোন প্রাণায়াম দরকার অথবা দরকার নয়, কোন প্রাণায়াম কতক্ষণ ধরে করা দরকার, প্রাণায়াম কোথায় করা দরকার, কখন করা উচিত, কীভাবে করা বেশি লাভদায়ক— ইত্যাদি একটু জেনে নেওয়া দরকার। কারণ ঠিক ঠিক ভাবে, ঠিক ঠিক সময়ে, ঠিক ঠিক মাত্রায় প্রয়োগ না করলে কোনো রোগই ভাল হবে না— শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে না।

প্রাণায়াম করার সময় : ভোরবেলা, সূর্য ওঠার আগে শৌচকর্মাদির পর, খালিপেটে প্রাণায়াম করা যায়। সূর্য ওঠার পর, সকালে টিফিন খাওয়ার ১ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত, টিফিন খাওয়ার ১ ঘণ্টা পর থেকে দুপুরের খাওয়ার এক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত, দুপুরের খাওয়ার সাড়ে-চার- পাঁচ ঘণ্টা পর থেকে রাতে নয়টার আগে পর্যন্ত প্রাণায়াম করা যায়। তবে প্রাণায়ামের জন্য সব থেকে উপযুক্ত সময় হলো স্নান করার আধ ঘণ্টা পর— অবশ্যই খালি পেটে।

প্রাণায়াম করার স্থান : জলাশয়ের কিনারে বাগিচায় বসে প্রাণায়াম করা দরকার। সুন্দর জলাশয়, ফুলের বাগান, সুন্দর সুন্দর ফুল, মৌমাছি-ভ্রমর গুনগুন করে গান করবে, ফুলের সুবাস নাকে আসবে এরকম স্থানে। কিন্তু বাস্তবে এইরূপ জায়গা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই বিকল্প হিসাবে ছাদে, দালানে, উঠানে, রকে বারান্দায় তা না হলে ঘরের মধ্যেই জানালা-দরজা খুলে প্রাণায়াম করা যায়। যে জায়গায় বসে করতে হবে সেই জায়গাটা একটু নরম— কম করে হাফ ইঞ্চি পুরু হওয়া দরকার। কাঁথা, কম্বল, গদি, সতরঞ্জি ইত্যাদি বসার জন্য যাই ব্যবহার করুন না কেন তা যেন বিদ্যুৎ-অপরিবাহী বা কুপরিবাহী হয়। প্রয়োজনে পরিস্কার বিছানায় বসেও প্রাণায়াম করা যায়। মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনে মশারি খাটিয়ে, শীতকালে গলা পর্যন্ত ঢাকা দিয়েও প্রাণায়াম করা যায়। শহরে যেখানে প্রদূষণের প্রভাব অত্যন্ত বেশি, সেই স্থানকে প্রাণায়ামের পূর্বে ঘৃত ও গুগ্গুলের দ্বারা সুগন্ধিত করে বা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে পরিবেশকে পবিত্র করে নেওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে, স্থানটি পবিত্র আর বিশুদ্ধ অক্সিজেন যুক্ত হওয়া দরকার। সেই সঙ্গে চাই মনের একাগ্রতা। প্রাণায়াম করার সময় পাখা না চালানোই ভাল। তবে খুব বয়স্ক ব্যক্তি বা খুব অসুস্থ ব্যক্তি— হার্টের রোগ থাকলে বা খুব কষ্ট হলে ধীর গতিতে পাখা চালানো যেতে পারে। ■

মহাচরিত্রাভিনেতা রাসবিহারী

মণীন্দ্র নাথ সাহা

আজ থেকে ১০১ বছর আগে ভারতবর্ষ ছেড়ে, কলকাতা ছেড়ে, মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু চলে গিয়েছিলেন জাপানে। ১৯১৫ সালের ১২ মে দেশের মাটি ত্যাগ করলেন। মারা গেলেন ২১ জানুয়ারি ১৯৪৫। জন্ম ২৫ মে ১৮৮৬। স্বাধীন ভারতের মাটিকে স্পর্শ করার তীব্র আকুতি ছিল কিন্তু বাস্তবে তা হয়ে ওঠেনি।

কে এই রাসবিহারী? মহানায়ক রাসবিহারীকে জানতে হলে অনেকগুলি দিন পিছিয়ে যেতে হবে। ফিরে যেতে হবে অগ্নিযুগের সেই রোমাঞ্চকর অধ্যায়ে, যা অক্ষয় হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়—

I was a fighter,
one fight more,
The last and
The best.

sd/-Rash Behari Bose
25.11.42

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু। এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস একদিন সৃষ্টি করেছিলেন এই মহানায়ক। ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের গোটা ইতিহাসটাই যেন রাসবিহারীর কাহিনিতে ভরা। কত কাহিনি, মিছিলের মতো সারি সারি কত ঘটনা।

১৯১২ সালে দিল্লীতে বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ। তারপর ভারতব্যাপী সেনা বিদ্রোহের আয়োজন। ধরা পড়ে একে একে প্রাণ উৎসর্গ করলেন কর্তার সিং, পিংলে, হরনাথ সিং, জগৎ সিং, মণীন্দ্র নাথ নায়েক এবং বসন্ত বিশ্বাস ও আরও অনেকে। ধরা গেল না সেই কর্মকাণ্ডের নায়ক রাসবিহারীকে। ইংরেজ সরকার তাঁর মাথার দাম ধার্য করল এক লক্ষ টাকা। তা সত্ত্বেও শাসকের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি পৌঁছে গেলেন জাপানে পি.এন. ঠাকুর পরিচয়ে। তিনি শুধু মহাবিপ্লবী ছিলেন না, ছিলেন একজন মহা চরিত্রাভিনেতাও।

এ ঘটনাটি ঘটেছিল কাশীতে। হঠাৎ সেদিন কী দেখে চমকে উঠলেন রাসবিহারী। বাইরে পুলিশ। গোটা বাড়িটাই ঘিরে ফেলেছে। কে আছে ভিতরে? হুঙ্কার শোনা গেল বাইরে থেকে। দরজা খোল। বেরিয়ে এলো একটি উড়ে ঠাকুর। চোখে মুখে তার ভয়ের ছাপ স্পষ্ট, যেন পুলিশ দেখে সে ভীষণ ভয় পেয়েছে। রাসবিহারী ভেতরে আছেন? ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান উড়ে ঠাকুরটি— বাবু ভেতরে আছেন, ঘুমোচ্ছেন। আর যায় কোথায় সঙ্গে সঙ্গে সবাই হুড়মুড় করে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল। কিন্তু কোথায় রাসবিহারী? আশ্চর্য, কেউ নেই। সেই উড়ে ঠাকুরটিও নেই। কথাবার্তার ফাঁকে কখন যে সে কেটে পড়েছে কেউ তা খেয়াল করেনি।

একবার কলকাতায় শেয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত সেদিন পুলিশে পুলিশে একাকার। রাসবিহারী এসেছেন। এখানেই কোথাও তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। একেবারে পাকা খবর। তন্নতন্ন করে সর্বত্র খোঁজা হলো, কিন্তু কোথায় রাসবিহারী! না, কোথাও নেই। অথচ খবর সত্যিই পাকা। কারণ শেয়ালদা পোস্ট অফিসের দোতলায় বসে যে প্রৌঢ় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভদ্রলোকটি তখন তন্ময় হয়ে বেহালায় সুর তুলেছিলেন, তিনি কিন্তু আসলে স্বয়ং রাসবিহারী ছাড়া আর কেউ নন।

পি এন ঠাকুরের ছদ্মবেশে রাসবিহারী।

একবার জন্মভূমি চন্দননগরে। চারপাশে সেদিন পুলিশের দৃঢ় বেষ্টনী। মশা-মাছির পর্যন্ত এদিক ওদিক মাথা গলাবার উপায় নেই। অভ্রান্ত খবর। রাসবিহারী এই বাড়িতেই আছেন। যে করেই হোক, এবার তাঁকে ধরতেই হবে। সব বৃথা। তার আগেই কখন যে এক ফাঁকে পাখি শিকলি কেটে উড়ে গেল, কেউ টেরও পেল না। কিন্তু কী করে এটা সম্ভব হলো! ইতিমধ্যে একটি প্রাণীও এবাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়নি। তাহলে গেল কোথায়? তবে কি ময়লার বালতি হাতে নিয়ে একটু আগে যে ঝাড়ুদারটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, তিনিই সেই রূপকথার যাদুকর মহানায়ক রাসবিহারী?

সত্যিই রূপকথার যাদুকর। প্রমাণ পাওয়া গেল অন্য একটি ক্ষেত্রে। সেই মুহূর্তেই তাঁর সে বাড়ি পরিত্যাগ করা দরকার। কিন্তু যাবেন কী করে? চারিদিকেই যে পুলিশ! সঙ্গে সঙ্গেই সমাধান। দেখা গেল কয়েকজন লোক একটা খাটিয়া কাঁধে নিয়ে শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলেছে। কণ্ঠে তাদের সেই পরিচিত ধ্বনি— রামনাম সত্ হ্যায়। রামনাথ সত্ হ্যায়। বিচিত্র মানুষ। বিচিত্র তাঁর

মন। বিচিত্রতর তাঁর কর্মধারা। কখনো বিদ্রোহী, কখনো পাকা অভিনেতা, কখনো বা সত্যিকারের একজন সুদক্ষ শিল্পী। মাঝে মাঝেই যখন তিনি বেহালায় করুণ সুর তোলেন তখন মনে হয় এই আপনভোলা মানুষটি বুঝি সংসারে স্বর ছাড়া আর কিছুই জানেন না।

১৯১৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারির সেনা অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার পর রাসবিহারী বাংলায় চলে এলেন। কিন্তু পুলিশ তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যে-কোনো দিন ধরা পড়তে পারেন। তার চাইতে তাঁর দূরে চলে যাওয়া উচিত। দূরে যেতে হলে পাশপোর্টের দরকার। এক্ষেত্রেও তিনি মহানায়ক।

পুলিশ যখন তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন নিজে একদিন পাসপোর্ট অফিসে ঢুকে প্রশ্ন করলেন : May I See Passport Officer ?

Yes, I am the Passport Officer, Please take your seat. ইংরেজ ভদ্রলোকটি শিষ্টাচার জানিয়ে বসতে বললেন।

Thank you. I am Raja P.N. Tagore, Poet Tagore's relative.

I am glad to meet you, what can I do for you?

I want a passport for Japan. You must have seen in the news paper that poet Tagore is shortly going to visit Japan. I am going there as his emissary to make the necessary arrangements for his stay there.

অর্থাৎ আমি কবিগুরুর আত্মীয় রাজা পি. এন. ঠাকুর। কবি শিগ্‌গির জাপান যাচ্ছেন। আমাকে আগে থেকেই সেখানে গিয়ে তাঁর জন্য যাবতীয় বন্দোবস্ত করতে হবে। সুতরাং অবিলম্বে পাশপোর্ট চাই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাশপোর্ট নিয়ে বেরিয়ে এলেন রাসবিহারী। একে রাজাবাহাদুর তাঁর ওপর পোয়েট রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি। একি চাট্টিখানি কথা! পাশপোর্ট অফিসারের কোনো সন্দেহ হবার কথা নয়।

১২ মে, ১৯১৫ সাল। পি. এন. ঠাকুর পরিচয়ে জাপানি জাহাজ 'সানুকি মারু'তে চেপে তাঁর একান্ত প্রিয় জন্মভূমিকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেলেন জাপানে। সঙ্গে কিছুই নিলেন না, শুধু দিয়েই গেলেন। সঙ্গের একমাত্র রিভলবারটাও শেষ পর্যন্ত তুলে দিয়ে গেলেন খিদিরপুর ডকের ১২নং জেটিতে দাঁড়ানো শচীন সান্যাল ও গিরিজাবাবুর হাতে।

জাপানে পৌঁছানোর পর সেখানকার নাগরিকত্ব পাবার জন্য ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে রাসবিহারীর বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এক রুটি কারখানার মালিক মিঃ সোমার মেয়ে তোসিকো'র সঙ্গে সবার অলক্ষ্যে। ১৯২৫ সালের ৪ মার্চ সর্বংসহা তোসিকো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে।

১৯২৪ সালে টোকিওতে সংগঠন গড়লেন Indian Independence League. ১৯৩৭ সালে Assian Youth Conference, তার পরেই এশিয়া মুক্তির ইস্তাহার তৈরি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ান মুক্তির পথ তৈরি করেছিলেন তিনি। ১৯৪১ সালে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গড়ে তুললেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। তাঁর আহ্বানে ১৯৪৩-এর ২ জুলাই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর পৌঁছলেন। ৪ জুলাই রাসবিহারী আই এন এ তথা আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব তুলে দিলেন সুভাষের হাতে। সুভাষ হলেন নেতাজী সে এক অন্য ইতিহাস।

স্বাস্থ্য কিছুদিন থেকে ভালো যাচ্ছিল না। রাসবিহারীর অসুস্থতার খবর শুনে স্বয়ং জাপান সম্রাট তাঁকে সম্মানিত করলেন জাপানের শ্রেষ্ঠ সম্মান— 'দি সেকেন্ড অর্ডার অফ দি মেরিট' পদক দিয়ে। নিঃসন্দেহে এটি একটি ইতিহাস। ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটল টোকিওর হাসপাতালে। সে খবর শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালেন মহামান্য জাপ সম্রাট। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শবাধার বহনের জন্য রাজ শকট পাঠিয়ে দিলেন, যা কেবলমাত্র রাজ পরিবারের লোকেদের জন্যই সীমাবদ্ধ।

একমাত্র রাসবিহারী ছাড়া এ ধরনের সম্মান প্রদর্শনের আর দ্বিতীয় কোনো নজির নেই জাপানের ইতিহাসে।

১৯৫৪ সালে জাপানি প্রতিনিধিদের সঙ্গে ড. অশোয়া (Dr. J.G. Ohsawa) এসেছিলেন রাসবিহারীর বাড়ি দেখতে। যিনি 'দি গ্রেট ইন্ডিয়ান ইন জাপান' নামে রাসবিহারী ও নেতাজীকে নিয়ে অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ বইয়ের লেখক। তিনি বেশ দুঃখের সঙ্গে রাসবিহারীর বৈমাত্রেয় ভাই বিজনবিহারীকে বলেছিলেন— ''তোমরা তোমাদের মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষার জন্য কী করেছ? তোমরা কি এটুকুও জানো না যে জাতীয় উন্নতির মূলে জাতীয় মহাপুরুষের পূজা, তাঁদের স্মৃতি- তর্পণ? তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের কী সম্পদ দিয়ে যাচ্ছো যার সাহায্যে তারা উত্তরকালে মহান হয়ে উঠবে? কী দিয়ে তাদের আভিজাত্য গড়ে উঠবে?'' (বিজনবিহারী বসুর স্মৃতি কথা)

শেষ করব প্রবীণ বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেনের কয়েকটা মূল্যবান কথা দিয়ে (উল্টোরথ, অগ্নিযুগ সংখ্যা)--- ''পথ রচনা করে গিয়েছেন, কতটুকু তাঁদের স্বীকৃতি দিয়েছে আজকের এই স্বাধীন দেশের মানুষ? সরকারি উদ্যোগে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, কোথায় বাংলাদেশের এই অগণিত মৃত্যুঞ্জয়ী শহিদদের স্থান? একটা পাতাও সেখানে তাঁদের জন্য ব্যয় করা হয়েছে কি? কোথাও দেওয়া হয়েছে কি তাঁদের এতটুকু স্বীকৃতি বা মর্যাদা?

না হয়নি। হাসিমুখে মৃত্যু বন্দনা করে যতই তাঁরা ভীত, আতঙ্কিত ভারতবাসীকে সেদিন অপরিম্লান জীবনের পথ দেখিয়ে থাকুন না কেন, আজ আর তাঁদের কোনো দামই নেই স্বাধীন দেশের এই ভাগ্য বিধাতাদের বিচারে। তাঁরা অপাংক্তেয়, ফসিল মাত্র। কেন এই হীনমন্যতা? কী এর কারণ?

বাংলাদেশের তথাকথিত 'ভ্রান্ত' বিপ্লবী সমাজ আর যাই করুন, লাভ লোকসানের হিসাব খতিয়ে কোনোদিনও দেশ সেবা করেননি। এটাই কি তাঁদের সবচাইতে বড় অপরাধ?''

মাধ্যমিক টপার সৌভিকের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত তৈরি হয়েছিল সারদা শিশু তীর্থে

সবাইকে চমকে দিয়ে ২০১৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম হলো প্রান্তিক শহর কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার সৌভিক বর্মন। বাবা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক। মা গৃহবধূ। মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের ছাত্র সৌভিকের প্রাথমিক শিক্ষা মাথাভাঙ্গা সারদা শিশু তীর্থে। বাংলায় ৯৪, ইংরেজিতে ৯৫, গণিতে ৯৮, ভৌতবিজ্ঞানে ১০০, জীবন বিজ্ঞানে ১০০, ইতিহাসে ৯৮, ভূগোলে ৯৮, সর্বমোট ৬৮৩ পেয়ে শীর্ষের শিরোপা অর্জন করেছে সৌভিক। এতবড়

উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সহ প্রান্ত প্রচারপ্রমুখ সাধন কুমার পাল সৌভিককে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

সাফল্যের জন্য সৌভিকের মুখে প্রাইভেট টিউটর, স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষক পিতার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের ভূমিকার কথা বিশেষ করে উঠে আসছে। তবে এই সাফল্যের পেছনে মূল কারিগর যে সৌভিকের মা একথা অকপটে স্বীকার করছেন বাবা পরেশ বর্মণ, এমনকী প্রতিবেশিরাও। উচ্চ শিক্ষিতা না হয়েও সময়, সঙ্গ ও প্রেরণা দিয়ে আদর্শ মায়ের মতো গৃহে পুত্রের প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সদা সক্রিয় ছিলেন বলেই সৌভিকের এত বড় সাফল্য। মায়ের বক্তব্য, ছোটবেলা থেকে সৌভিক পড়াশোনাটাকে ভালোবাসতো। ক্রিকেট ফুটবল ভালোবাসলেও পড়তে থাকা বিষয় অসম্পূর্ণ রেখে কখনো খেলতে যেতো না। ছোটদের জন্য কি পরামর্শ প্রশ্ন করাতে সৌভিকের স্পষ্ট উত্তর বড় সাফল্য অর্জন করতে হলে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে তেমনি মা-বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথাও শুনতে হবে।

সৌভিকের সাফল্যের খবরে উচ্ছ্বসিত সমগ্র মাথাভাঙ্গা। ফল প্রকাশের পর দুদিন ধরে শুভেচ্ছা, সংবর্ধনা, অভিনন্দন, মিষ্টি মুখের জোয়ারে ভাসতে দেখা যায় সৌভিকের পরিবারকে। অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলেন সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ প্রচারক প্রমুখ সাধন কুমার পাল, পশ্চিম কোচবিহার জেলা স্তরের কার্যকর্তা ও মাথাভাঙ্গা সারদা শিশু তীর্থের আচার্যরা। প্রধানাচার্য ধনঞ্জয় বর্মনকে কাছে পেয়ে এত শুভেচ্ছা সংবর্ধনার মাঝেও সৌভিক এটা জানাতে ভোলেনি যে তার মূল্যবোধের শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার ভিত তৈরি হয়েছিল সারদা শিশু তীর্থের অনুশাসন যুক্ত পরিবেশে। সৌভিকের আফশোষ মাথাভাঙ্গায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মতো নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। আপাতত লক্ষ্য মাথাভাঙ্গা হাইস্কুল থেকেই উচ্চ মাধ্যমিকেও মাধ্যমিকের মতো সাফল্যের ধারবাহিকতা ধরে রাখা।

জাতীয়তাবাদী শিক্ষক সংগঠন বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সঙ্ঘ ও বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের এক যৌথ প্রতিনিধি দল সৌভিকের বাড়িতে গিয়ে, পুষ্পস্তবক, মানপত্র ও কিছু উপহার সামগ্রী দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

সমাবেশ সমাচার

সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ

গত ৮ মে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ শাখার সাধারণ প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ শুরু হয়েছে হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দিরে। বর্গে ২৮০ জন শিক্ষার্থী ২১৩ স্থান থেকে অংশগ্রহণ করেছেন। বর্গাধিকারী হিসেবে আসানসোল জেলা সঙ্ঘচালক নিরঞ্জন মাকুড়, বর্গ কার্যবাহ বর্ধমান বিভাগ ঘোষ শিক্ষণ প্রমুখ রণজিৎ ঘোষ, মুখ্য শিক্ষক নদীয়া সহ বিভাগ প্রচারক কর্ণধর দে এবং বৌদ্ধিক প্রমুখ বীরভূম বিভাগ প্রচারক দেবাশিস অধিকারী দায়িত্ব পালন করছেন।

গত ১০ মে খড়্গাপুরের কাছে গোপালী আশ্রমে পূর্বক্ষেত্রের সাধারণ ২য় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ শুরু হয়েছে। মোট সংখ্যা ১৮৪ জন। এর মধ্যে দক্ষিণবর্গ ৯৫, আন্দামান ৯, উত্তরবঙ্গ ২৮, পূর্ব ওড়িশা ১৫ এবং পশ্চিম ওড়িশার ২০ জন। ক্ষেত্রের ১৭১ স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছেন। সর্বাধিকারী হিসেবে পূর্বক্ষেত্রের বৌদ্ধিক প্রমুখ ড. তিলক রঞ্জন বেরা, কার্যবাহ মেদিনীপুর বিভাগ কার্যবাহ প্রকাশ রঞ্জন মণ্ডল, মুখ্যশিক্ষক প্রান্ত ঘোষ শিক্ষণ প্রমুখ গৌরাঙ্গ খাঁড়া এবং উত্তরবঙ্গ সহ প্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী দায়িত্ব পালন করছেন। পূর্বক্ষেত্রের প্রাক্তন সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন খড়্গাপুর ডিএভি স্কুলের প্রিন্সিপাল নন্দকুমার গৌতম। উল্লেখ্য, গত ১৩ থেকে ১৬ মে বর্গে সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত উপস্থিত ছিলেন। আন্দামানেও সাধারণ প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ শুরু হয়েছে। ৭১ জন শিক্ষার্থী দ্বীপসমূহ থেকে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায় প্রথম দিকে কয়েকদিন উপস্থিত ছিলেন। বিশেষভাবে গত ২১ মে মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিম বাজারে এবং বিশেষ দ্বিতীয় বর্ষ বিহারের মুঙ্গেরে শুরু হয়েছে। গত ১৫ মে থেকে নাগপুরে তৃতীয় বর্ষ শুরু হয়েছে। মোট সংখ্যা ৯৭৮। এর মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ ১৯ ও উত্তরবঙ্গ ৯।।

With Best
Compliments
from -

A
Well Wisher

B.M.

শব্দরূপ-৭৮৮ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

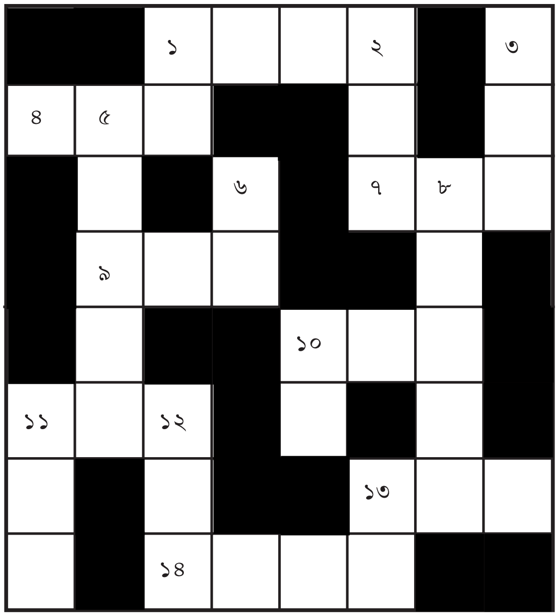

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. লক্ষবার অগ্নিতে দগ্ধ করে যার বিশুদ্ধি সাধন করা হয়েছে, **৪.** দুর্ভিক্ষ, **৭.** ভাগ্য, অদৃষ্ট, নিয়তি, **৯.** বোয়াল মাছ, **১০.** সম্পন্ন, সিদ্ধ (কাজ — করা'), **১১.** পদ্যে লিখিত ইতিবৃত্ত (বৈষ্ণব সাহিত্যে), **১৩.** উপাস্য, **১৪.** বিষ্ণু; প্রথম দুয়ে অন্তিম।

উপর-নীচ : ১. '— ঝুঁটি কাকাতুয়া, ধরেছে যে বায়না', **২.** এক অসুরের নাম, **৩.** মথুরার নিকটস্থ গ্রাম, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি, **৫.** মুসলমান আমলের এক হিন্দু ব্রাহ্মণ যিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করে বহু মন্দির ধ্বংস করে এই নামে পরিচিত হন, **৬.** এটা টানলে মাথা আসে, **৮.** 'ওগো নদী, আপনবেগে ---', **১০.** '--- বসেছে শুক্রবারে, **১১.** বৈশেষিক-দর্শন প্রণেতা, **১২.** চল্লিশ বছর বয়সের কাছাকাছি যে দৃষ্টি দোষ জন্মে, **১৩.** মাতামহী, দিদিমা।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৮৫
সঠিক উত্তরদাতা

সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম
টিঙ্কু হালদার
পূর্ব কলেজপাড়া
রায়গঞ্জ

		কা	লা	শৌ	চ		হা
ধ	ক	ল			রা		উ
	র্ণ		হ		নি	মা	ই
	কু	বে	র			লা	
	হ			বা	বু	ই	
গ	র	বা		লী		চা	
ন্ধ		য়			উ	কি	ল
র্ব		স	ম	ত	ল		

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

◻ ৭৮৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৩ জুন ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

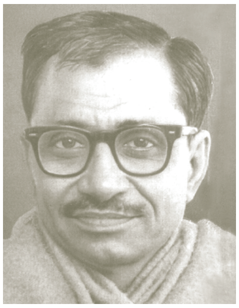

ইংরেজি রিলিজিয়নের অর্থ মত, পন্থ, মজহব। এর দ্বারা ধর্ম বোঝানো যায় না। ধর্মের ব্যাপক অর্থ রয়েছে। তা জীবনের সমস্ত দিকে পরিব্যাপ্ত। তার দ্বারা সমাজ ও বিশ্বচরাচরের ধারণা সৃষ্টি হয়। তাই এর নাম ধর্ম। ধর্মের মূল তত্ত্ব সনাতন ও সর্বব্যাপী। তার ব্যবহার দেশ, কাল, পরিস্থিতি সাপেক্ষ হয়। এই নিয়মগুলির সম্পূর্ণ সংহিতা এবং তার তাত্ত্বিক ভিত্তির নাম ধর্ম। এই নিয়ম মর্জিমাফিক হয় না।

* * *

রাজ্য রাষ্ট্রের রক্ষার নিমিত্ত সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রের আদর্শকে ব্যবহারে আনার জন্য বা আনার অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য রাজ্য উৎপন্ন হয়। রাষ্ট্রের আদর্শ হলো 'চিতি'। তার অভিব্যক্তি ও ব্যবহারের নিয়মকেই সেই রাষ্ট্রের ধর্ম বলা হয়। যদি আমাদের প্রাণ কোথাও থাকে তবে তা ধর্মেই আছে। ধর্ম থেকে বিচ্যুতি হলে আমরা প্রাণহীন হয়ে যাই। সেজন্য যিনি ধর্ম বর্জন করেছেন, তিনি রাষ্ট্র থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। তাঁর সব কিছুই শেষ হয়ে গিয়েছে।

* * *

ধর্মে আমাদের বিশ্বাস কেবল তার উপযোগ করার জন্য নয়, বরং তা সহজাত। রাজ্যের ভিত্তিকেও আমরা ধর্ম মনে করি। শুধু দণ্ডনীতি রাজ্য চালাতে পারে না। মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ না থাকলে রাজ্য ঠিকমতো চলতে পারে না। কর্ম ও পৌরুষতা ধর্মের দ্বারাই সাধিত হয়। মানুষের খেয়ালখুশিকে রাশ টানতে, তাদের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রতিহত করতে, প্রেয়র পিছনে শ্রেয়কে না ভুলতে ধর্মই সহায়ক হয়। সেজন্য ভারতবর্ষে ধর্মের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা।। বিক্রমাদিত্য।। ২৪

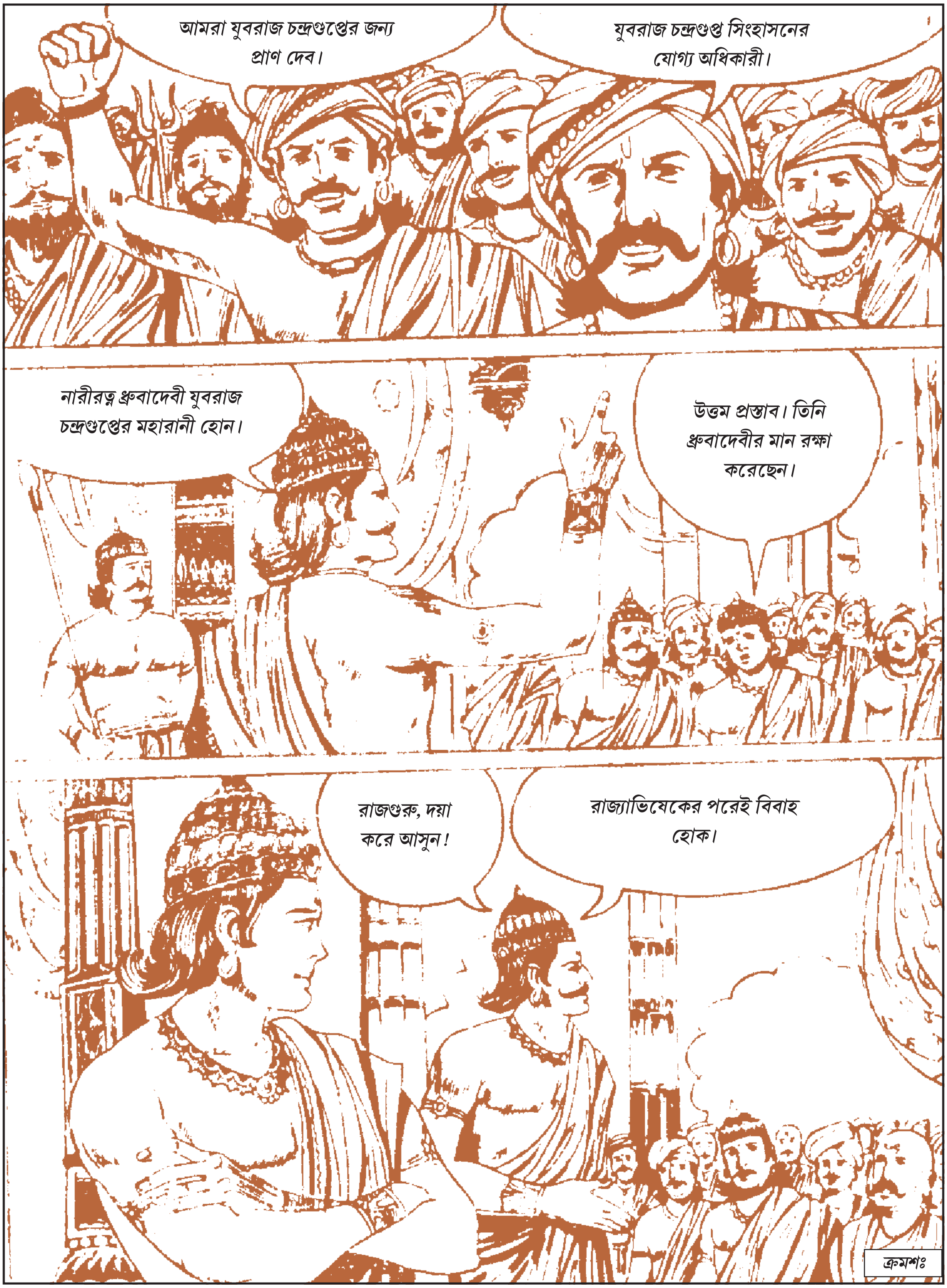

৩৫ জন নার্সকে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সারা দেশের ৩৫ জন নার্সকে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করলেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি পুরস্কৃত নার্সদের

অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে নার্সদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পোলিও প্রতিষেধক দেওয়া, সন্তান প্রসব করানো অথবা সাধারণ স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রদান যে কোনো ক্ষেত্রেই একজন প্রশিক্ষিত নার্সের প্রয়োজন সবার আগে। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জ এই শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে, সব দেশকেই তাতে অংশ নিতে হবে। কোনো দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান যদি আশানুরূপ না হয় তাহলে সেই দেশ রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়নের মাপকাঠিতে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য। এদিকে রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা জানিয়েছেন, নার্সিং-এর মান আরও উন্নত করার জন্য সরকার নানান ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে নতুন জিএনএম স্কুল স্থাপন যেমন আছে, তেমনি রয়েছে চালু নার্সিং স্কুল এবং কলেজগুলির উন্নতিসাধন। নার্সদের প্রশিক্ষণে জোর দিচ্ছে সরকার, বাড়ানো হচ্ছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রাথমিক সুযোগসুবিধা। মন্ত্রী আরও জানান, সরকারের স্বাস্থ্য পোর্টালে নার্সিং এবং সন্তান প্রসব করানোর ধাত্রীবিদ্যা সংক্রান্ত সব তথ্য পাওয়া যাবে।

ভারতীয় কর্মীর চাহিদা বাড়তে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বিশেষ ভাষণে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, ২০৩০ সাল নাগাদ ভারতের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার উপযুক্ত বয়সে পৌঁছে যাবেন। অর্থাৎ সেইসময় ভারতের অর্ধেক মানুষের বয়েস হবে পঁচিশের আশেপাশে। তিনি জানান, এই বিশাল সংখ্যক কর্মী ভারতের সম্পদ এবং বিপদ দুইই হতে পারে। তাঁর মতে, 'সম্পদ তখনই হবে যদি আমরা তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে পারি। যদি তাদের চাকরির বাজারে যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারি।' ৩২০০০ ছাত্রছাত্রীর সুষ্ঠু পঠন-পাঠনের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রণববাবু এদিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দেন। প্রশংসা করেন গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা ক্যাম্পাসের এবং বাহ্যিক ও আত্মিক উন্নতির উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতির। তাঁর ভাষণে তিনি দেশের জাতীয় স্বার্থের সহায়ক বিষয়ের গবেষণায় ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানান। মনে করিয়ে দেন সরকার এই ধরনের বিষয়ে গবেষণার জন্য নানারকম বৃত্তি ও অনুদান চালু করেছে। সেই সুযোগ সকলের গ্রহণ করা উচিত। সব শেষে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মদনমোহন মালব্যকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা আখ্যা দিয়ে বলেন, মহামনা সঠিক কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বেনারসকে বেছে নিয়েছিলেন। কারণ ভারতীয় সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশে এই শহরের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

রুপোর মেডেল দেশে ফিরল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যে মেডেল দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সৈনিকদের সম্মানিত করা হোত, তারই একটা নমুনা ইংলন্ড থেকে দেশে ফিরল। একটি আটমুখী তারার মাঝখানে মেডেলটি— তাতে খোদাই করা বাঘের মুখ ও দুটি শব্দ— 'আজাদ হিন্দ'। ফিরিয়ে আনার কাজটি করেছেন কলকাতাবাসী সংগ্রাহক পৃথ্বীশ দাসগুপ্ত। তিনি জানিয়েছেন, আজাদ হিন্দের কমব্যাট ও নন-কমব্যাট দু'ধরনের বাহিনীই ছিল। কুশলী যোদ্ধাদের সম্মানিত করা হোত সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জের মেডেল দিয়ে। আরও জানা গেছে, দীর্ঘকাল আগে জেমি ক্রস নামের এক ব্যবসায়ী জার্মানির নিলামঘর থেকে মেডেলটি কিনেছিলেন। মেডেলটি দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য নেতাজীর প্রপৌত্র চন্দ্র বসু পৃথ্বীশবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পরিবেশ রক্ষায় সৌর রেল চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমাতে সৌরশক্তির দিকে পা বাড়াল ভারতীয় রেল। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই পরীক্ষামূলকভাবে রেলের উত্তর-পশ্চিম বিভাগের যোধপুরে সৌরশক্তি চালিত ট্রেন চালানো হবে বলে নর্থ-ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে বিভাগের পাবলিক রিলেশন অফিসার গোপাল শর্মা জানিয়েছেন। ৫০টি

ডিজেল চালিত রেকের উপর সৌর প্যানেল লাগানোর বরাত দেওয়া হয়েছে জ্যাকসন ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের উপর। একটি রেকে ছ'টি কোচ থাকে। প্রতিটি কোচের ছাদে ১২টি সৌর প্যানেল থাকবে যা থেকে ৩০০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। কোচের ভিতর সিএফএল আলো ফ্যান চালাতে সাধারণত ১.৫ কিলোওয়াট লাগে, এই প্যানেল থেকে কোচপিছু ৩.৬ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। পরীক্ষামূলকভাবে সৌর ট্রেন চালানোর পরই নির্দিষ্ট রুট ঠিক করা হবে। রেলমন্ত্রক আশা করছে এর ফলে প্রতি রেকে ৯০,৮০০ লিটার ডিজেল বাঁচবে যার ফলে ২৩৯ টন কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ বন্ধ করা যাবে।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
23 May - 2016 - Rs. 10.00

गांव का विकास - प्रदेश का विकास - देश का विकास

ग्रामोदय से भारत उदय अभियान
मध्यप्रदेश

14 अप्रैल से 31 मई, 2016

अभियान के दौरान -

- ग्राम पंचायत विकास और जल संरक्षण कार्ययोजना।
- हितग्राहियों का चिन्हांकन, सत्यापन।
- किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि विकास योजना।
- स्वच्छ भारत अभियान से ग्रामीणों को जोड़ना।
- महिला सभाओं का आयोजन।
- ग्राम संसद का आयोजन।
- राजस्व प्रकरणों का निराकरण।
- पर्यावरण संरक्षण की कार्ययोजना।
- 'स्कूल चलें हम' अभियान की रणनीति।

सशक्त गांव
समृद्ध देश

"यह अभियान आपके गांव के विकास के लिये और लोगों के कल्याण के लिये है। इसलिये मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, पूरी तन्मयता के साथ इस अभियान में भाग लीजिये। अपने गांव की योजना बनाने में हमें सहयोग कीजिये। आइये हम मिलजुलकर अपने गांव को विकसित बनायें, गांव के विकास से ही प्रदेश का विकास होगा।"

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2016

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी